

অপরাজেয় কথাসিদ্ধী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



প্রাচ্যাক্ত

প্রথম পর্ব
কিশোর সংস্করণ

মূলত সংক্ষিপ্ত কিশোর-সংস্করণ
প্রত্যেকখানির মূল্য দেড়টাকা

এম. এ. এ.
দে য্যাও কোং
কলিকাতা

পরিবেশক —

এম. এল. দে য্যাণ্ড কোং

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

১৩/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২.

প্রথম মুদ্রণ—১৩৫৭

সম্পাদক : শ্রীকরণাসিদ্ধু গালিত এম.এ.

সংক্ৰিপ্তীকরণ : শ্রীপুলিনবিহারী নন্দ এম. এ. বি এল.

রূপায়ণ : আর্ট-পাবলিশিটি সার্ভিস

STATE CENTRAL LIBRARY BENGAL

ACCESSION NO. 741-22222

DATE..... ৮ ২২ ২০০৮

অনুসৃত সম্পাদন-রীতির বিশেষত্ব :—

- শরৎচন্দ্রের কথা-শিল্পমৈপুণ্য, রচনা-মাধুর্য্য ও ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।
- শরৎচন্দ্রের রচনা-রীতির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া মূলরসের গতি অব্যাহত রাখা হইয়াছে। ভাষা কোথাও বিকৃত করা হয় নাই।
- মূলগ্রন্থের অনুরূপ প্রতিটি পরিচ্ছেদ অনুসরণ করা হইয়াছে।
- কোম কোম স্থানে বিবেচিত অংশগুলি হৃদকোশে বর্জিত করিয়া অল্প-সময়ের পাঠোপযোগী করা হইয়াছে।
- কিশোরদের জন্ত প্রয়োজন্যভিত্তিক রচনারসের সংক্ষেপ করিয়া তাহাদের পাঠোপযোগী করা হইয়াছে।
- বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান-সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠোপযোগী করিয়া তাহাদের মন শরৎ-সাহিত্য পাঠে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

কলিকাতা, ১৩/১ কলেজ স্কোয়ার থেকে—দে ব্রাদার্স এর পক্ষে

শ্রীহরিশোহন দে প্রকাশ করেছেন। আর ১৪৮৭ জনগণ্য বস্ত্র লেন, লক্ষ্মীবিলাস গ্রেসে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু ছেপেছেন।

নিবেদন

আমাদের প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বঙ্গিম গ্রন্থাবলীর
অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং সহৃদয় স্রষ্টাপাঠকমণ্ডলীর
উৎসাহ ও সহায়ত্বের অমুপ্রেরণায় শরৎচন্দ্রের রচনা-
বলীরও কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত
হইল। বিশ্বসাহিত্যে এতাদৃশ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অপ্রচলিত।
ভিক্টর হিউগো, আলেকজান্ডার ডুমা, জেন্ অষ্টিন,
ডিকেন্স, থ্যাচারে প্রভৃতি যুরোপের সুপ্রসিদ্ধ
ঔপন্যাসিকগণের রচনাবলীর বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সংস্করণ
বহুদিন যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলার ঔপন্যাসিক প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক
অপরাজেয় কথাসিন্ধী শরৎচন্দ্রের জীবন্ত রচনাবলীর
অঙ্গচ্ছেদ শরৎ-সাহিত্যাহুরাগী ব্যক্তি মাত্রের নিকট
অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। অদ্ব্যন
ত্রিশবৎসর যাবৎ বাংলার পাঠকবর্গ শরৎ-সাহিত্যের
রসান্বাদন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ একদিকে
শিক্ষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির ফলে রসপিপাসু পাঠক-
পাঠিকার সংখ্যা যেমন বিপুলভাবে বর্ধিত হইতেছে, অপর
দিকে তেমন মহাকালের রথচক্রে নিম্নোক্ত বাংলার
জনসাধারণের অন্তরাত্মা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া
উদগ্র লালসামন্ত নররাক্ষসকূলের করাল মুখব্যাধানের
সম্মুখে পরিত্রাহি চিৎকার করিতেছে। সাহিত্য-রসান্বাদ
দূরে থাকুক, শীর্ণ দেহপিঞ্জরটীকে বহন করিবার মত
বৎসামাত্র উপকরণ-সংগ্ৰহে সমর্থ হইতেছে না। বুদ্ধিস্ব

দেহের অন্তঃপুরে ততোধিক বুদ্ধি মানবাত্মা নিখ্যাতিত ও নির্বাসিত হইতেছে।

শরৎ-সাহিত্য বাংলার পল্লীসমাজের দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, পতিত ও অবহেলিত নর-নারীর মর্ম্মবাণী। আজ ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতির রঙ্গক্ষেত্রে নীতিবাগাশ ধুরন্ধর-গণের গগনবিদারী বাকবিতণ্ডা ভেদ করিয়া বাংলার সর্ম্মহারা পতিত ও পতিতার ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী আর্তনাদ উথিত হইতেছে। রমা, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, কিরণাশী, সতীশ, শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি মৃত্যুহীন নরনারীবৃন্দ বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাহাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহাদিগকে বিপ্লবী সমাজদ্রোহী নাস্তিক শরৎচন্দ্রের উষ্ণ-মস্তিষ্কের কলুষ কল্পনাপ্রসূত বলিয়া তাচ্ছিল্যভরে নাসিকা কুঞ্চনের দিন চিরতরে কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। বাংলার ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সমাজের পুতিগন্ধময় নগ্ন কঙ্কালমূর্ত্তি তাহার অন্তর দেবতাকে লাক্ষিত অপমানিত ও সহস্রবৃশ্চিক দংশনে ক্ষর্জরিত করিতেছে।

বাংলার তথা বাঙ্গালীর জীবনেতিহাসের এক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তাহার অন্তর-দেবতার একনিষ্ঠ সাধক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজারী—তাহার সহস্রশীর্ষ সমাজ-ব্যবস্থার পদতলে নিপীড়িত নরনারীর একক মুখপাত্র—মানব-ধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন—দরদী শরৎচন্দ্র।

বঙ্গভারতীর বেদীমূলে তাঁহারই প্রদত্ত মহাপূজার সহস্রোপচার বাঙ্গালী উত্তরাধিকার-স্বত্রে লাভ করিয়াছে। আমরা তাঁহার অকিঞ্চন সেবকরূপে সেই উপচার-সামগ্রী হইতে সংগৃহীত পঞ্চোপচারে বঙ্গভারতীর সমস্ত পূজার

আয়োজন করিলাম। উপকরণের অন্তর দ্বারা অন্তরের
শ্রদ্ধাভক্তির বিচার সর্বদেশে সর্বকালে মনোবিগণ অস্বীকার
করিয়াছেন। আমাদের এই পূজায় ধনী-দরিদ্র, সুশিক্ষিত
অল্প শিক্ষিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সমান অধিকার যাহাতে
অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই উদ্দেশ্যে সাহিত্য বিনোদনে ভীতিপ্রদ
ব্যয়বাহ্য ও সময়বাহ্য উভয়েব হস্ত হইতে নিকৃতি
পাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল।

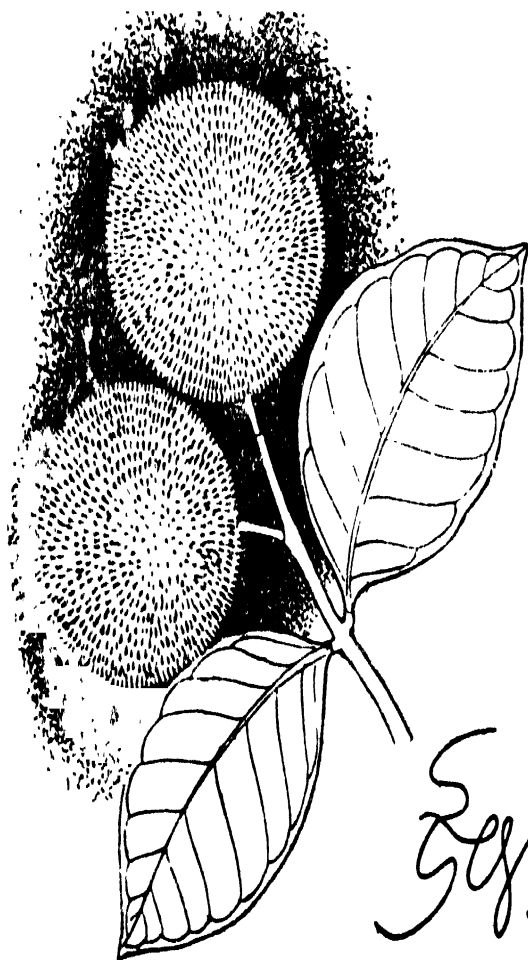
বঙ্গভারতীয় এই সংক্ষিপ্ত পূজামুষ্ঠানে যদি বাংলার
পাঠক পাঠিকা সবাক্রমে যোগদান করেন, তবেই আমাদের
এ আয়োজন সার্থক হইবে—পরিশ্রম জয়যুক্ত হইবে।

এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ-কার্যে আমরা ত্রীষুজ প্রকাশচক্র
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধেয় ত্রীষুজ
করুণাসিন্ধু পালিত এম্-এ মহোদয়ের সম্পাদনা-কার্যে
সক্রিয় সহায়ভূতি আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত
করিয়াছে। এবং এই পরিকল্পনার অন্ত্র অগ ইন্ডিয়া রেডিওর
শ্রীশ্রীধর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।
এতদ্ব্যতীত এই সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ প্রকাশে যে সমস্ত
সাহিত্যানুরাগী ও শিক্ষাত্রী আমাদের উৎসাহ ও
প্রেরণা দানে অমুগ্ধীত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই
আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।
ইতি—

শরৎ-জন্ম দিবস
৩১ ভাদ্র, ১৩৫০
কলিকাতা

}

অশ্রব প্রকাশক



54278

শ্রীকান্ত

প্রথম পর্ক

এক

আমার এই ‘ভব-ঘুরে’ জীবনের আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে !

কিন্তু, কি করিয়া ‘ভব-ঘুরে’ হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক । তাহার নাম ইন্দ্রনাথ । আমাদের প্রথম আলাপ একটা ‘ফুটবল মাচে’ । আজ সে নাচিয়া আছে কি না, জানি না । কারণ বহুবৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রতুষে ঘর-বাড়ী, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না । উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে !

ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের ‘ফুটবল মাচ’ । সন্ধ্যা হয় হয় । মগ্ন হইয়া দেখিতেছি । আনন্দের সীমা নাই । হঠাৎ—ওরে বাবা—এ কি রে ! চটাপট শব্দ এবং মারো শালাকে ! ধরো শালাকে ! কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম । মিনিট

দুই-তিন ! ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না । ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আস্ত-ছাত্তির বাঁট পটাশ করিয়া ভাঙিল এবং আরো গোটা দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর উত্তত দেখিলাম । পাঁচসাতজন মুসলমান-ছোকরা তখন আমার চারিদিকে বাহ রচনা করিয়াছে—পলাইবার এতটুকু পথ নাই ।

আরও একটা ছাত্তির বাঁট—আরও একটা । ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্রোহগতিতে বাহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ ।

ছেলেটি কালো । তাহার বাঁশীর মত নাক, প্রশস্ত স্ফুটল কপাল, মুখে দুই চারিটা বসন্তের দাগ । মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে কিছু বড় । কহিল, ভয় কি ! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস ।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা বাহা ছিল, তাহা স্ফুটলভ হইলেও, অসাধারণ হয় ত নয় । কিন্তু তাহার হাত দুখানি যে সতাই অসাধারণ, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই ।

শুধু জোরের জঘ্ন বলিতেছি না । সে দুটি দৈর্ঘ্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত পড়িত । ইহার পরম সুবিধা এই যে, যে-ব্যক্তি জ্ঞানিত না, তাহার কপ্পিন্‌কালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুক্যাদাত করিবে । সে কি মুষ্টি ! বাঘের খাবা বলিলেই হয় ।

মিনিট-দুয়ের মধ্যে তাহার পিঠ-ঘেসিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল, পালা।

ছুটিতে শুরু করিয়া কহিলাম, তুমি ? সে রুক্ষভাবে জবাব দিল, তুই পালা না—গাধা কোথাকার !

গাধাই হই—আর বাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—না।

ছেলে-বেলা মারপিট কে না করিয়াছে ? কিন্তু পাড়ারগায়ের ছেলে আমরা—মাস দুই-তিন পূর্বে লেখাপড়ার জন্ত সহরে পিসিমার বাড়ী আসিয়াছি—ইতিপূর্বে এ ভাবে দল বাঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আশু ছুটা ছাতির বাঁট পিঠের উপরও কোনদিন ভাঙ্গে নাই। তথাপি একা পলাইতে পারিলাম না। ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, না—তবে কি ? দাঁড়িয়ে মার খাবি না কি ? ঐ, ওই দিক থেকে ওরা আসচে—আচ্ছা, তবে খুব কসে দৌড়ো—

এ কাজটা বরাবরই খুব পারি। বড় রাস্তার উপরে আসিয়া যখন পৌছান গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং পথের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের উপর এখানে একটা, আর ওই ওখানে একটা জ্বালা হইয়াছে। ইন্দ্র অতি সহজ স্বাভাবিক-গলায়—এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই—মারে নাই, মার খায় নাই, ছুটিয়া আসে নাই—না, কিছুই নয় ; এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কিরে ?

শ্রী—ক—স্ত—

শ্রীকান্ত ? আচ্ছা । বলিয়া সে তাহার পকেট হইতে সিগ্রেট ও দেশলাই বাহির করিয়া, ধরাইয়া ফেলিল । চারিদিকে লোক—প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফেলে ?

ফেল্লেই বা ! সবাই জানে । বলিয়া সে চলিয়া গেল ।

তারপরে মাস-খানেক গত হইয়াছে । সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম তেমনি অন্ধকার । কোথাও গাছের একটা পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না । ছাদের উপর সবাই শুইয়া ছিলাম । বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই । হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল । সহজ রামপ্রসাদী সুর । কত ত শুনিয়াছি, কিন্তু বাঁশীতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে তাহা জানিতাম না । বাড়ীর পূর্ব-দক্ষিণকোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান । ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজখবর লইত না । সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল । শুধু গরু বাছুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়ে সরু একটা পথ পড়িয়াছিল । মনে হইল, যেন সেই বনপথেই বাঁশীর সুর ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে । পিসিমা উঠিয়া বসিয়া, তাহার বড়ছেলেকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, হাঁ রে নবীন, বাঁশী বাজায় কি রায়েদের ইস্ত্র না কি ? বুঝিলাম, হাঁহারা সবলেই ওই বংশীধারীকে চেনেন । বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশীই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে ?

বলিসু কি রে ? ও কি গোসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসুচে না কি ?

বড়দা বলিলেন, হাঁ ।

পিসিমা ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ওর মা কি বারণ করে না ? গোঁসাইবাগানে কত লোক যে সাপে-কামড়ে মরেচে, তার সংখ্যা 'নেই—আচ্ছা, ও জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছোঁড়াটা কেন ?

বড়দা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর কেন ! ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায় আসার এই সোজা পথ । যার ভয় নেই, প্রাণের মায়া নেই, সে কেন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে মা ? ওর শিগগির আসা নিয়ে দরকার । তা, সে-পথে নদী-নালাই থাক্ আর সাপ-খোপ বাঘ-ভালুকই থাক্ ।

ধ্বি ছেলে ! বলিয়া পিসিমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন । বাঁশীর স্বর ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া আবার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল ।

এই সেই ইন্দ্রনাথ । সেদিন ভাবিয়াছিলাম, যদি অতখানি জোর এবং এম্নি করিয়া মারামারি করিতে পারিতাম ! আর আজ রাত্রে যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি অম্নি করিয়া বাঁশী বাজাইতে পারিতাম ।

কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি ! সে যে আমার অনেক উচ্ছে । তখন ইন্ধুলেও সে আর পড়ে না । শুনিয়াছিলাম, হেডমাস্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্ম্মাহত হইয়া স্থগাভরে ইন্ধুলের রেলিঙ ডিঙাইয়া বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল, আর যান্ন নাই । অনেকদিন পরে তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম, সে অপরাধ অতি অকিঞ্চিৎ । হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর ক্লাশের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ

হইত। এমনি এক সময়ে সে তাহার গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ, পণ্ডিতজী বাড়ী গিয়া তাঁহার নিজের শিখাটি নিজের চাপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন—খোয়া যায় নাই। তথাপি কেন যে পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই, এবং হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন—সে কথা আজ পর্য্যন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে নাই। সেটা পারে নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে, ইস্কুল হইতে রেলিঙ ডিঙাইয়া বাড়ী আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না। কিন্তু খোলা ছিল, কি ছিল না, এ দেখিবার সখও তাহার আদৌ ছিল না। ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙি ছিল; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—এক। তাহারই উপর। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা-তোতে পান্সি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; দশ-পনের দিন আর তাহার কোন উদ্দেশ্যই পাওয়া গেল না।

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক্ গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয়-ভাই নিত্য প্রথামত বাহিরে বৈঠকখানায়

ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যান্সিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্নাতদ্ভাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্মদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুকায় ধূমপান করিতেছেন। দেউড়াতে হিন্দুস্থানী-পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই, মেজদার কঠোর তদ্বাবধানে নিঃশব্দে বিজ্ঞানভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার-দুই এণ্ট্রান্স ফেল্ করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত্ত কাহারে সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাত হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদার ‘পাশে’র পড়ার বিষয় না করি, এই জন্ম তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশ খানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত ‘বাইরে’, কোনটাতে ‘থুথুফেলা’, কোনটাতে ‘নাক-ঝাড়’, কোনটাতে ‘তেম্কা পাওয়া’ ইত্যাদি। যতীনদা একটা ‘নাকঝাড়’ টিকিট লইয়া মেজদার স্তম্ভে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—হু—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্ম সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা ‘থুথুফেলা’ টিকিট

পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারি করিয়া মিনিট-দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেফা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল। মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—হুঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্য্যন্ত। পরওনা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘড়ি দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গাঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহপরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদার অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সূক্ষ্মতায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিছাভাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ার ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা-সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত আমাদেরকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে তা আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদার দুর্ভাগা, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ব বোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল্ করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার? যাক্—এখন আর সে দুঃখ জানিয়া কি হইবে!

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপলোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়ন-রত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম! মেজদা তাঁহার সেই টিকিট আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা-পাওয়াটা আমার আইন-সম্মত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা ‘হুম’ শব্দ; এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্দ্রকণ্ঠের গগনভেদী ‘রৈ-রৈ চীৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেলে রে! কিসে ইঁহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্রাৎ-বেগে তাঁহার দুইপা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদার ছিলো ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে ‘জৌ জৌ’ করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চোঁচাইয়া বাড়ী ফাটাইয়া ফেলিতেছেন।

এই সুযোগে একটা চোর না কি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ীর সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো—মার ডালে—ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল । দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল । তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়ী-স্বাক্ষ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল । আরে, এ যে ভট্টচাষামশাই !

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাথার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে মুখে হাত বুলাইয়া দেয় । ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার !

পাথার বাতাস ও জলের বাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন । সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন ক'রে ছুটছিলেন কেন ? ভট্টচাষামশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভাল্লুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এল ।

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, 'ভালুক নয় বাবা একটা নেকড়ে বাঘ । হুম্ ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে পা-পোষের উপর বসেছিল ।

মেজদা'র চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াঃ সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার' ।

কিন্তু কোথা সে ? মেজদার 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে আসিনই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায় ? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা কিছু বটেই !

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না ! কিন্তু

সবাই লঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং ‘উহ বয়ঠা’ বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি-কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই এক সঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়। কাহারো মূহূর্ত্ত বিলম্ব নয় না। উঠানের একপ্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার! বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্যে হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও! আমাদের পাশের বাড়ীর গগনবাবুদের একটা মুগ্গেরি গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। ‘লাও’ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিমগাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাসা দেখিতে যাহার! বাড়ী ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তক্ক।

এমন বিপদের সময় হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। নিমেষে শতকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু কণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিশ্বাসে এই ডাকাত

ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল, এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নাগিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিস্কার বাঙ্গালা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরুপী। ইন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্টাচাৰ্য্যমশাই খড়ম হাতে সর্বদাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—হারামজাদা তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না ?

পিসেমশাই মহাত্ৰোধে লুকুম দিলেন, কান পাকড়কে লাও।

কিশোরী সিং গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্টাচাৰ্য্যমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দি বলিতে লাগিলেন, এই বজ্রাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—

ছিনাতের বাড়ী বারাসাতে। সে প্রতিবৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়ীতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্টাচাৰ্য্যমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও

ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়া ছিল। ভাবিয়াছিল, একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

হিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে, সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হস্ত নি। যে বৌরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ীর ঐ খোঁটাগুলোকে। একটা ছোটছেলের যা সাহস, একবাড়ী লোকের তা নেই। পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে আরও গরম হইয়া লুকুম দিলেন, উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

ইন্দ্র আমার দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বুঝি এই বাড়ীতে থাকিস্ শ্রীকান্ত ?

আমি কহিলাম, হাঁ। তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্চ ?

ইন্দ্র হাসিয়া কহিল, রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা। আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে—মাছ ধ'রে আনতে। যাবি ?

আমি সম্বয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত অন্ধকারে ডিঙিতে চড়বে ?

সে আবার হাসিল। কহিল, ভয় কি রে! সেই ত মজা। তা ছাড়া অঙ্ককার না হ'লে কি মাছ পাওয়া যায়? সাঁতার জানিস্?

খুব জানি।

তবে আয় ভাই! বলিয়া সে আমার একটা হাত ধরিল। কহিল, আমি একলা এত স্রোতে উজোন-বাইতে পারিনে— একজন কাউকে খুঁজি, যে ভয় পায় না।

আমি আর কথা কহিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে রাস্তার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে যে কত বড় আকর্ষণ, তাহা তখন বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধাই ছিল না। অনতিকাল পরে গৌসাইবাগানের সেই ভয়ঙ্কর বনপথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ইন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

খাড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বখবৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই প্রায় ত্রিশ হাত নীচে সূচীভেদ্য আঁধার। পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া, আবর্ত রচিয়া উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি বাঁধা আছে।

আমি নিজেও নিতান্ত ভীকু ছিলাম না। কিন্তু ইন্দ্র যখন উপর হইতে নীচে একগাছি রজ্জু দেখাইয়া কহিল, ডিঙির এই দড়ি ধ'রে পা-টিপে টিপে নেবে যা; সাবধানে নাবিস্, পিছলে পড়ে গেলে আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; তখন যথার্থই

আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি আমার ত দড়ি অবলম্বন আছে, কিন্তু তুমি ?

সে কহিল, তুই নেবে গেলেই আমি দড়ি খুলে দিয়ে নাব্ব। ভয় নেই, আমার নেবে যাবার অনেক ঘাসের শিকড় বুলে আছে।

আর কথা না কহিয়া আমি দড়িতে ভর দিয়া অনেক যত্নে অনেক দুঃখে নীচে আসিয়া নৌকায় বসিলাম। তখন দড়ি খুলিয়া দিয়া ইন্দ্র বুলিয়া পড়িল। সে যে কি অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিল, তাহা আজও আমি জানি না। ভয়ে বৃকের ভিতরটায় এমনি টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল যে, তাহার পানে চাহিতেই পারিলাম না ! মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মত্ত-গর্জ্জন ছাড়া কোথাও শব্দমাত্র নাই। হঠাৎ ছোট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইন্দ্র দুই হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া চড়িয়া বসিল। ক্ষুদ্র তরি তীব্র একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

দুই

কয়েক মুহূর্তেই ঘনাক্ষকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল-প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্রগতিশীল এই ক্ষুদ্র তরগীটি এবং কিশোরবয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতি দেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজিও ভুলিতে

পারি নাই। বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর
সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি।

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র
বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোন্‌খানে যে
লক্ষ্য স্থির করিয়া হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে, তাহার
কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় মাঝি, তখন
তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কথা কহিল, কি রে শ্রীকান্ত,
ভয় করে ?

আমি বলিলাম নাঃ—

ইন্দ্র খুঁসি হইয়া কহিল, এই ত চাই—সাঁতার জান্লে অ'বার
ভয় কিসের ! প্রত্যুত্তরে আমি একটি ছোট নিঃশ্বাস চাপিয়া
ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকার
রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার
জানা, এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।
সেও আর কোন কথা কহিল না। বহুকণ এইভাবে চলার পরে
কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ ; কিন্তু নৌকা যত
অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে
লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শোনা
যায় ? সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল,
জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।

জিজ্ঞাসা করিলাম কত বড় পাড় ? কেমন স্রোত ?

সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ, তাই ত, কাল জল হয়ে গেছে,
আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙ্গে

পড়লে ডিঙি শুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব। তুই দাঁড় টানতে পারিস ?

পারি।

তবে টান্।

আমি টানিতে শুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, উই—উই যে কালো মত বাঁ-দিকে দেখা যায়, ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পঁাকে পুতে দেবে।

এ আবার কি কথা ! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে ! ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর ত পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁদিকের রেষ ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাব কি ক'রে ? ফিরে আসতে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।

তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই, বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া উঠিল—তবে এলি কেন ? চল্ তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ ! তখন চোদ্দ পার হইয়া পোনরয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুসি হইয়া বলিল, এইত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারী পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাব যে শালারা টেরও পাবে না।

একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেনই বা কি ? ধরা কি মুখের কথা ? ছাখ, শ্রীকান্ত, কিছু ভয় নেই—বাটাাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেললে ব'ল—আর পালাবার যো নেই, তখন রূপ ক'রে লাফিয়ে পড়ে একডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখবার জোটি নাই তারপর মজা ক'রে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোর-বেলায় সাঁত্রে এপারে এসে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ী ফিরে গেলেই বাস ! কি করবে বাটারা ?

চড়টার নাম শুনিয়াছিলাম ; কহিলাম সতুয়ার চড়া ত ঘোরনালার স্তমুখে, সে ত অনেক দূর।

ইন্দ্র তচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দূর ? ছ-সাত কোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরে গেলে চিত হয়ে থাকলেই হ'ল—তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না।

জেলেদের নৌকাগুলো তখন অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের মত দেখাইতেছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছান গেল।

ধীবর-প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এস্থানটায় পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না তখন এ-ধার হইতে ও-ধার পর্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দিকে জাল টাঙাইয়া

রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় রুই-কাতলা ভাসিয়া অসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ও দিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনর, বিশ সের রুই-কাতলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্কের নিমিষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র ডিগ্গিখানা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল, এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

এত মাছ কি হবে ভাই ?

কাজ আছে। আর না, পালাই চল্। বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেম্নি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা দমক্ মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিগ্গি পাশের ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতি-পরিবর্তনে আমি চমকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি ? কি হ'ল ?

ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ ! শালারা টের পেয়েছে—চারখানা ডিগ্গি খুলে দিয়েই এদিকে আসচে—ঐ জ্ঞাপ্। তাই ত বটে ! প্রবল জলতাড়নার ছপাছপ শব্দ করিয়া তিনখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্ত যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, স্রমুখে ইহারা—পলাইয়া নিক্ষেপিত পাইবার এতটুকু স্থান নাই। ১

কি হবে ভাই? বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্বের পাঁচ-ছয় দিন ইন্দ্র নিবিব্ধে প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর। কোথাও জল এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল; পাঁকে লগি পুতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর একহাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল।

সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

নীচে কেন?

ডিঙি টেনে বার করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে ?

ও গঙ্গায় । খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব ।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম । ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম । অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানাস্ত্রা পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাকট শব্দে চম্কাইয়া উঠিলাম । সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই ? সে উত্তর দিল, চাঘারা মাচার উপরে বসে বুনো শূয়ার শাড়ছে ।

বুনো শূয়ার ! কোথায় সে ? ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাজিলাভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে বলব ? আছেই কোথায়ও এইখানে । জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম । ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল ! সন্ধ্যারাত্রীে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম । এ জঙ্গলে যে বুনো শূয়ারের হাতে পড়িব, তাহা আর বিচিত্র কি ! তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া ; কিন্তু ঐ লোকটি একবুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে । এক পা নড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই । মিনিট-পোনর এইভাবে কাটিল । আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম । প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার ভুটাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া ‘ছপাৎ’ করিয়া শব্দ হইতেছে । একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই । সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট করলাম । খাড়া শূয়ার না হইলেও বাচ্ছা-টাচ্ছা নয় ত ?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে ; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ।

কিছু না—সাপ ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম । অক্ষুটে কহিলাম, কি সাপ, ভাই ?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে । টোঁড়া, বোড়া, গোখরো, করেত্—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই দেখচিস্ নে ?

সে ত দেখ্‌চি । কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল । সে লোকটি কিন্তু ভ্রঞ্জেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না । ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো-তিনটে ত আমার গা-ঘেঁষে পালাল । এক একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া-টোড়া হবে বোধ হয় । আর কামড়ালেই বা কি করব । মরতে একদিন ত হবেই ভাই !

ওই লোকটি কি ! মানুষ ? দেবতা ? পিশাচ ? কে ও ? ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না ! বুকখানা কি পাথর দিয়ে তৈরী ? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়া মায়াও কি ওই পাথরের মধ্যে নিহিত ছিল ! আর আজ ? সমস্ত বিপদের বার্তা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিতচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল ; একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—‘শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা ।’ জীবন্মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থতাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে । ঐ

যে বিনা আড়ম্বরে সামান্তভাবে বলিয়াছিল, মরতে একদিন ত হবেই, এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায় ? যাক্ সে কথা । ক্রমশঃ ঘোর কল-কল্লোল নিকটবর্তী হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতেছিলাম । ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে করিয়া সম্মুখবর্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল । কহিল, আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েছি । মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই । কিন্তু কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও ত বুঝিলাম না । পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উদ্দ্যবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে ।

তখন ছিন্ন ভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল । কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না । দেখিলাম ভূট্টা-জন্যের চড়া ডান দিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতেই লাগিল ।

ভিন

বড় ঘুম পেয়েছে ইন্দ্র, বাড়ী ফিরে চল না ভাই ! ইন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিল, ঘুম ত পাবার কথাই ভাই ! কি করুব শ্রীকান্ত, অনেক কাজ রয়েছে । আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন ? এখানে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে না ?

আমি গুটিশুটি হইয়া সেই তক্তাখানির উপর শুইয়া পড়িলাম । কিন্তু ঘুম আসিল না । স্তিমিতচক্ষে চুপ করিয়া আকাশের গায়ে

মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে লাগিলাম। ঐ ডোবে, ঐ ভাসে, আবার ডোবে, আবার হাসে।

ইতিমধ্যে যে ঘণ্টা-দুই কাটিয়া গেছে তাহা টেরও পাই নাই। ঘাড়টা একটু তুলিয়া দেখিলাম, নৌকা এবার ওপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিয়াছে। প্রশ্ন করিবার বা একটা কথা কহিবার উদ্দমও তখন বোধ করি আমার মধ্যে আর ছিল না ; তাই তখনি আবার তেমনি করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। বোধ করি আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল।

খস্—স্—বালুর চরে নৌকা বাধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এ কোন্ যায়গা ? বাড়ী আমাদের কত দূরে ? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুই ত কোথাও দেখি না ? প্রশ্ন করিবার পূর্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইন্দ্র কহিল, একটু বোস শ্রীকান্ত ; আমি এখুণ্নি ফিরে আসব—তোর কিছু ভয় নেই। এই পাড়ের ওধারেই জেলেদের বাড়ী।

সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না।

অতএব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, ভয় করব আবার কিসের ? বেশ ত, যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে, মাথার উপর আবার সেই আলো-ঈধারের লুকোচুরি

খেলা এবং পশ্চাতে বলদূরগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জজন। আর স্তম্ভে সেই বালির পাড়। এটা কোন্ যাযগা তাই ভাবিতেছি, দেখি, ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিস্নে—খবরদার ব'লে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়েও যদি কেউ আসে, তবু দিবি—বল্‌বি, মুখে তোর ছাই দেব—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার হাতে ক'রে দিতে যাস্নে যেন—ঠিক আমি হলেও না,—খবরদার।

কেন ভাই ?

ফিরে এসে বল্‌ব—খবরদার কিন্তু—, বলিতে বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনি ছুটিয়া দৃষ্টির বহিভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা উপশিরা দিয়া বরফজল বহিয়া চলিতে লাগিল। বোধ করি ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়াছিলাম ! প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল পাড়ের ওদিক হইতে কে যেন ঊঁকি মারিয়া দেখিতেছে। যেন্নি আড়চোখে চাই, অন্নি সেও যেন মাথা নিচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ চলিয়া গিয়াছে— আর ফিরিতেছে না।

মনে হইল যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধান্তে শতপাকে বেঁটন করিয়া মুখ নিচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক কথাবার্তা বলিতে বলিতে এই দিকেই আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর দুইজন হিন্দুস্থানী। কিন্তু সে যাহা হউক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবামাত্র আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না। কারণ এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলে-বেলা হইতেই জানিতাম যে, ইহাদের ছায়া থাকে না।

যাক। যাহারা আসিল, তাহারা অসাধারণ ক্ষিপ্ততার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জালের মত একপ্রকার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তৎপরিবর্তে ইন্দ্র হাতে যাহা গুঁজিয়া দিল, তাহার একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদু মধুর শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল কিন্তু স্রোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁষিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লগি ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না। কারণ আমার মন তখন তাহার বিরুদ্ধে ঘূণায় ও কি এক প্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ছিঃ ! ছিঃ ! এমনি করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিল ? এতক্ষণ এই মাছ-চুরি ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে চুরির আকারে স্থান পায় নাই। কেন না, ছেলে-বেলায় টাকা-কড়ি চুরিটাই শুধু যেন বাস্তবিক চুরি ; আর সব—অথায় বটে—কিন্তু কেমন করিয়া যেক

সে সব ঠিক চুরি নয়—এমনিই একটা অদ্ভুত ধারণা প্রায় সকল ছেলেরই থাকে। আমারও তাই ছিল। না হইলে, এই ‘টুং’ শব্দটি কানে যাইবামাত্রই এতক্ষণের এত বীরত্ব, এত পৌরুষ, সমস্তই এক মৃহভ্বে এমন শুকতৃণের মত ঝরিয়া পড়িত না। সে যদি মাছগুলি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিত, কিংবা—আর যাহাই করুক, শুধু টাকা-কড়ির সহিত ইহার সংশ্রাব না ঘটাইত, তাহা হইলে আমাদের এই মৎস্য-সংগ্রাহের অভিযানটিকে কেহ চুরি বলিলে ক্রোধে বোধ করি তাহার মাথাটাই ফাটাইয়া দিতাম এবং সে তাহার গায়া প্রাপ্য পাইয়াছে বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু ছিঃ, ছিঃ! এ কি! একাজ ত জেলখানার কয়েদারী করে!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাসনি, না রে শ্রীকান্ত?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি এখানে একলা আসতে পারো?

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না?

না। রামনাম করি। কিছুতেই তারা আসতে পারে না। একটু থামিয়া কহিল, রামনাম কি সোজা রে? তুই যদি নাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চলে যাস, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা হ’লেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি কর্চে—তারা সব অশুধামো কি না।

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাঁকরের পাড় শুরু হইল।

ওপার অপেক্ষা এপারে স্রোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল, স্রোত যেন উল্টামুখে চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি তুলিয়া বোটে হাতে করিয়া কহিল, ঐ যে সাম্নে বনের মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ঐখানে আমি একবার নেবে যাব। যাব আর আসব। কেমন ?

অনিচ্ছা-সঙ্গেও বলিলাম, আচ্ছা। কারণ, না বলিবার পথ ত একপ্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আবার ইন্দ্রও আমার নির্ভীকতা সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

অনুকূল স্রোত এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানি তরু তরু করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। বামদিকে স্ম-উচ্চ কঁাকরের পাড়, দক্ষিণদিকের চরের বিস্তৃতি বশতঃ এ যায়গাটা একটি ছোট-খাটো হ্রদের মত হইয়াছিল—শুধু উত্তরদিকের মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ডিঙি বেঁধে উপরে উঠবার ত ঘাট নেই, তুমি যাবে কি ক'রে ?

ইন্দ্র কহিল, ঐ যে বটগাছ ; ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতেছিল। অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কি পচেছে, ইন্দ্র !

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা। সবাই ত পোড়াতে পারে না—মুখে একটুখানি আগুন ছুইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোন্‌খানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই ?

ঐ হোথা থেকে হেথা পর্য্যন্ত—সবটাই শ্মশান কি না ।
যেখানে হোক ফেলে রেখে ঐ বটতলার ঘাটে চান ক’রে বাড়ী
চ’লে—আরে দূর ! ভয় কি রে ! ও শিয়ালে শিয়ালে লড়াই
কর’চে । আচ্ছা, আয় আয়, আমার কাছে এসে বোস্ ।

আমার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া
তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম । সে ক্ষণকালের
জন্ম আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি
শ্রীকান্ত ? কত রাত্তিরে একা আমি এই পথে যাই আসি—
তিনবার রামনাম করলে কার সাধ্যা কাছে আসে ?

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটু সাড়া পাইলাম—
অশ্রুটে কহিলাম, না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখানে
কোথাও নেবো না—সোজা বেরিয়ে চল ।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত,
একটিবার যেতেই হবে । এই টাকা কটি না দিলেই নয়—তারা
পথ চেয়ে বসে আছে—আমি তিনদিন আস্তে পারিনি ।

টাকা কাল দিয়ে না ভাই !

না ভাই, অমন কথাটি বলিস্নে । আমার সঙ্গে তুইও চল—
কিন্তু কারুকে এ কথা বলিস্নে যেন ।

আমি অশ্রুটে ‘না’ বলিয়া তাহাকে তেমনি স্পর্শ করিয়া
পাধরের মত বসিয়া রহিলাম । গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া
গিয়াছিল । কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল লইব, কি নড়া চড়ার কোন
প্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধ্যই আমার আর ছিল না ।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এই জল ইন্দ্র পূর্বদ্বারেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়ঙ্করিত স্বরে 'ইন্' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম, স্মৃতরাং উভয়েই প্রায় এক সময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকাল মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণ ভাবে আমার চোখে পড়ে নাই! উভয়েই নির্বাক, নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের ছোটপুষ্ট বালক— তাহার সর্ববাস্ত জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসৃচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারী মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ-বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি।

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য; কিন্তু ছোঁয়া-ছুঁয়ের প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে,

কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া সে ঢের ঢের কঠিন কাজ ! একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র রক্তের বংশধর হইয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের বাধা-বাঁধি, তাহাতে এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে ?

কুণ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি হোঁবে ? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অগ্ৰহাত হাঁটুর নীচে দিয়া, একটা শুক ভৃগুখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়া-ছিঁড়ি করে খাবে। আহা ! মুখে এখনো এর ওয়ুধের গন্ধ পয্যন্ত রয়েছে রে ! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে ?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না ?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি ? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে ? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরী হোক—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বল্বে না—আমগাছ, জামগাছ—বুঝিলি না ? এও তেমনি।

দৃষ্টান্তটি যে নেহাৎ ছেলেমানুষের মত, এখন তাহা জানি। কিন্তু অন্তরের মধ্যে ইহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না—কোথায়

যেন অতি তীক্ষ্ণ সত্য ইহারই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে । মাঝে মাঝে এমনি খাঁটি কথা সে বলিতে পারিত । উদ্দেশ্যকে গোপনে রাখিয়া কোন কাজ সে করিতেই জানিত না । তাহার শুদ্ধ সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের উমেদারী না করিয়াই ঠিক ব্যাপারটি টের পাইত । বাস্তবিক, অকপট সহজ-বুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি । আমার নিজের জীবনেই তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বলিবার লোভ এখানে সম্বরণ করিতে পারিতেছি না ।

একদিন অপরাহ্ন-কালে সংবাদ পাওয়া গেল যে, একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও-পাড়ায় সকাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছেন —কোনমতেই তাঁহার সৎকারের লোক জুটে নাই । না জুটিবার হেতু এই যে, তিনি কাশী হইতে ফিরিবার পথে রোগগ্রস্ত হইয়া এই সহরেই রেলগাড়ী হইতে নামিয়া পড়েন এবং সামান্য পরিচয়সূত্রে যাহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আজ সকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ‘বিলাত-ফেরৎ’ এবং সে সময়ে ‘একঘরে’ । ইহাই বৃদ্ধার অপরাধ ।

যাহা হউক, সৎকার করিয়া পরদিন সকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল, প্রত্যেকেরই বাটীর কবাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে । শুনিতে পাওয়া গেল, গতরাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত হারিকেন-লণ্ঠন হাতে সমাজপতিরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, এবং স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, এই অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপকর্ম (দাহ) করার জন্য এই কুলঙ্গারদিগকে কেশচ্ছেদ করিতে হইবে, ‘ঘাট’ মানিতে হইবে, এবং এমন একটা বস্তু সর্বসমক্ষে ভোজন করিতে

হইবে, যাহা সুপবিত্র হইলেও খাওয়া নয় ! তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া প্রতি বাড়ীতেই বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের কোনই হাত নাই ; কারণ জীবিত থাকিতে তাঁহারা অশাস্ত্রীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই ঘটিতে দিতে পারিবেন না । আমরা অন্তোপায় হইয়া ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হইলাম । তিনিই তখন সহরের সববশেষ চিকিৎসক এবং বিনা দক্ষিণায় বাঙালীর বাটীতে চিকিৎসা করিতেন । আমাদের কাহিনী শুনিয়া ডাক্তারবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাশ করিলেন, যাহারা এইরূপ নির্যাতন করিতেছে, তাহাদের বাটীর কেহ চোখের সম্মুখে বিনাচিকিৎসায় মরিয়া গেলেও তিনি সেদিকে আর চাহিয়া দেখিবেন না । কে এ কথা তাঁহাদের গোচর করিল, জানি না । দিবা অবসান না হইতেই শুনিলাম, কেশচ্ছেদের আবশ্যকতা নাই, শুধু ‘ঘাট্’ মানিয়া সেই সুপবিত্র পদার্থটা ভক্ষণ করিলেই হইবে । আমরা স্বীকার না করায় পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম, ‘ঘাট্’ মানিলেই হইবে—ওটা না হয় নাই খাইলাম । ইহাও অস্বীকার করায় শোনা গেল, আমাদের এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তাঁহারা এমনই মার্জ্জনা করিয়াছেন—প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই ! কিন্তু ডাক্তারবাবু কহিলেন, প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে এই দুটা দিন ইহাদিগকে ক্রেশ দিয়াছেন, সেই জন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ ; অর্থাৎ কাহারও বাটীতে যাইবেন না । তারপর সেই সন্ধ্যা-বেলাতেই ডাক্তারবাবুর বাটীতে একে একে বৃদ্ধ সমাজপতিদিগের শুভাগমন হইয়াছিল । কিন্তু আমরা দিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়ই নাই ।

থাক্, কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। চড়ার উপর আসিয়া সেই অপরিচিত শিশুদেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল, তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র, এইবার চল।

ইন্দ্র অশ্রুমনস্কভাবে কহিল, কোথায় ?

এই যে বল্লে, কোথায় যাবে ?

থাক্—আজ আর না।

আমি খুসী হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ী যাই।

প্রত্যন্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস্ ?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানিনে ; তুমি বাড়ী চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ী রেখে এস।

‘ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না। কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। তথাপি আমি যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুম, তখন সে চুপি চুপি স্পর্শক বল্লে, ভেইয়া ! আমি কম্পিতকণ্ঠে কঁাদ কঁাদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। ইন্দ্র কথা কহিল না, মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে ‘রামনাম কর, সে নৌকা ছেড়ে যাবনি—আমার পেছনেই ব’সে আছে।

তারপর সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আর আমার মনে নাই। যখন চোখ চাহিলাম তখন অন্ধকার নাই—নৌকা কিনারায় লাগানো। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল, কহিল এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে ব'স।

চার

গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া সকাল-বেলা রক্তচক্ষু ও একান্ত-শুক্লান মুখে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। এই যে! এই যে! করিয়া সবাই সমস্বরে এমনি অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল যে, আমার জংপিণ্ড থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

যতীনদা প্রায় আমার সমবয়সী। অতএব তাহার আনন্দটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্নত চীৎকার শব্দে—এসেচে শ্রীকান্ত—এই এল মেজদা! বলিয়া বাড়ী ফাটাইয়া আমার আগমন-বার্তা ঘোষণা করিয়া দিল, এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া পরম সমাদরে আমার হাতটি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বৈঠকখানায় পাপোষের উপর দাঁড় করাইয়া দিল।

সেখানে মেজদা গভীর মনোযোগের সহিত পাশের পড়া পড়িতেছিলেন। মুখ তুলিয়া একটিবার মাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন। শাস্তি দিবার এত বড় মাহেন্দ্রযোগ তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

মিনিটখানেক চুপচাপ । সারারাত্রি বাহিরে কাটাইয়া গেলে কর্ণযুগল ও উভয় গণ্ডের উপর যে সকল ঘটনা ঘটিবে, আমি তাহা জানিতাম । কিন্তু আর যে দাঁড়াইতে পারি না ! অথচ কর্ম্মকর্ত্তারও ফুরসৎ নাই । তাঁহারও যে আবার পাশের পড়া !

পাঁজিটা একবার দেখ্ দেখি রে সতীশ, এ বেলা আবার বেগুন খেতে আছে না কি ; বলিতে বলিতে পাশের দ্বার ঠেলিয়া পিসিমা ঘরে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন ।—কখন এলি রে ? কোথায় গিয়েছিলি ? ধনি ছেলে বাবা তুমি—সারা রাত্রিটা ঘুমোতে পারিনি—না খাওয়া, না দাওয়া ; কোথা ছিলি বল্ ত হতভাগা ? মুখ কালিবর্ণ, চোখ রাঙা—ছল্ ছল্ করছে—বলি জ্বরটর হয়নি ত ? কই, কাছে আয় ত, গা দেখি—একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করিয়া পিসিমা নিজেই আগাইয়া আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়াই বলিয়াই উঠিলেন, যা ভেবেচি তাই । এই যে বেশ গা গরম হয়েছে । এমন সব ছেলের হাত-পা বেঁধে জল-বিছুটি দিলে তবে রাগ যায় । তোমাকে বাড়ী থেকে একেবারে বিদায় ক'রে তবে আমার আর কাজ । চল্ ঘরে গিয়ে শুবি আয় হতভাগা ছোঁড়া ! বলিরা তিনি আমার হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন ।

মেজদা জলদগন্তীরকণ্ঠে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন ও যেতে পারবে না ।

কেন, কি কর্বে ও ? না না, এখন আর পড়তে হবে না । আগে যা হোক দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমোক । আয় আমার সঙ্গে, বলিয়া পিসিমা আমাকে লইয়া চলিবার উপক্রম করিলেন ।

কিন্তু শিকার যে হাতছাড়া হয় ! মেজদা স্থান-কাল ভুলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন—খপরদার ! যাগ্নে বল্চি শ্রীকান্ত । পিসিমা পর্যন্ত যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন । তারপর মুখ ফিরাইয়া মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন, স'তে ? পিসিমা অতান্ত রাশভারি লোক । বাড়ী-স্কন্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত । মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল । আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন । কথাটা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকিত না ।

পিসিমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি ; কখনও, কোন কারণেই তিনি চেষ্টামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না । হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না । তিনি কহিলেন, তাই বুঝ ও ঠাঁড়িয়ে এখানে ? দেখ, সত্যি, যখন তখন শুনি, তুই ছেলেদের মারধোর করিস্ । আজ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস্ আমি জানতে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব । বেহায়া, নিজে ফি বছর ফেল হচ্ছে—ও আবার যায় পরকে শাসন করতে । কেউ পড়ুক, না পড়ুক, কারকে তুই জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করতে পাবিনে । বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন । মেজদা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল । এ আদেশ অবহেলা করবার সাধ্য বাড়ীতে কাহারো নাই—সে কথা মেজদা ভাল করিয়াই জানিত ।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পিসিমা তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে আনিয়া

কাপড় ছাড়াইয়া দিলেন এবং পেট ভরিয়া গরম গরম জিলাপি আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া—বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন ।

মিনিট-পাঁচেক পরেই খুট্ করিয়া সাবধানে শিকল খুলিয়া ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া একটুখানি দম্ লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, মেজদাকে মা কি হুকুম দিয়েচে জানিস্ ? আমাদের কোন কথায় তার থাকবার জো-টি নেই । তুই, আমি, য'তে একঘরে পড়'ব—মেজদা অন্য ঘরে পড়'বে । আমাদের পুরাণো পড়া বড়দা দেখবেন ! ওকে আমরা আর কেয়ার কর'ব না ! বলিয়া সে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল ।

যতীনদাও পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল । ছোড়দাকে এই শুভ সংবাদ দিয়া সে-ই এখানে আনিয়াছিল । প্রথমে সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল । হাসি থামিলে নিজের বুকে বারংবার করাঘাত করিয়া কহিল, আমি ! আমি ! আমার জগ্গেই হ'ল তা জানো ? ওকে আমি মেজদার কাছে না নিয়ে গেলে কি মা হুকুম দিত ! ছোড়দা, তোমার কলের লাটুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে, তা বলে দিচ্ছি ।—আচ্ছা দিলুম । নিগে যা আমার ডেস্ক্ থেকে, বলিয়া ছোড়দা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া ফেলিল । কিন্তু এই লাটুটা বোধ করি সে ঘণ্টাখানেক পূর্বের পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না ।

এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য ! এমনই মানুষের ব্যক্তিগত শ্রায্য অধিকার লাভ করার আনন্দ । আজ আমার কেবলই

মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্মূল্যতা এক বিন্দু কম নয়।

মনে পড়ে সেই রাত্রেই জ্বরটা প্রবল হইয়াছিল এবং সাত-আট দিন পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলাম।

তার কতদিন পরে স্কুলে গিয়াছিলাম এবং আরও যে কতদিন পরে ইন্দ্রর সহিত আবার দেখা হইয়াছিল, তাহা মনে নাই। কিন্তু সেটা যে অনেক দিন পরে, একথা মনে আছে। সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি। গঙ্গার জল মরিতে সুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া, ছিপ দিয়া ট্যাঙরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি। অনেকেই ধরিতেছে। হঠাৎ চোখ পড়িল কে একজন অদূরে একটা শর-বাড়ের আড়ালে বসিয়া টপাটপ মাছ ধরিতেছে। লোকটিকে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু তাহার মাছ-ধরা দেখা যায়। অনেকক্ষণ হইতেই আমার এ জায়গাটা পছন্দ হইতেছিল না। মনে করিলাম, উহাবই পাশে গিয়া বসি। ছিপ হাতে করিয়া একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইবা মাত্র সে কহিল, আমার ডান্দিকে বোস্। ভাল আছি স্ ত রে শ্রীকান্ত ? বুকের ভিতরটা ধক করিয়া উঠিল। তখনও তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই ; কিন্তু বুঝিলাম এ ইন্দ্র। পাশে গিয়াও বসিলাম ; কিন্তু তখনও কথা কহিতে পারিলাম না।

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ফিরে এসে বড় মার খেয়েছিলি—না রে শ্রীকান্ত ? আমি তোকে নিয়ে গিয়ে ভাল কাজ করিনি। আমার সেজ্ঞে রোজ বড় দুঃখ হয়। আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম,

মার খাই নাই। ইন্দ্র খুঁসি হইয়া বলিল, খাস্‌নি! দেখ্‌রে শ্রীকান্ত, তুই চলে গেলে আমি না কালীকে অনেক ডেকেছিলুম—যেন তোকে কেউ না মারে। কালীঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা রে! মন দিয়ে ডাকলে কখনো কেউ মার্ত্তে পারে না। না এসে তাদের এমনি ভুলিয়ে দেন যে, কেউ কিছু করতে পারে না। বলিয়া সে ছিপটা দুই হাতে করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বোধ করি তাঁকেই মনে মনে প্রণাম করিল। বঁড়সীতে একটা টোপ দিয়া সেটা জলে ফেলিয়া বলিল, আমি ত ভাবিনি তোর ছর হবে; তা হ'লে সেও হ'তে দিতুম না।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলাম, কি করতে তুমি? ইন্দ্র কহিল, কিছুই না। শুধু জবাফুল তুলে এনে মা কালীর পায়ে দিতুম। উনি জবাফুল বড় ভালবাসেন। যে যা ব'লে দেয় তার তাই হয়। এ ত সবাই জানে। তুই জানিস্‌নে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অসুখ করে নি? ইন্দ্র আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার? আমার কথ'খনো অসুখ করে নি। কথ'খনো কিছু হয় না! হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, দেখ্‌ শ্রীকান্ত, আমি তোকে একটা জিনিস শিখিয়ে দেব। যদি তুই দুবেলা খুব মন দিয়ে ঠাকুরদেবতার নাম করিস—তাঁরা সব সামনে এসে দাঁড়াবেন, তুই স্পষ্ট দেখতে পাবি। তখন আর তোর কোন অসুখ করবে না। কেউ তোর একগাছি চুল পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না—তুই আপনি টের পাবি। আমার মতন যেখানে খুঁসি যা, যা-খুঁসি কর, কোন ভাবনা নেই। বুঝলি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হঁ, বঁড়সীতে টোপ দিয়া জলে

ফেলিয়া যত্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কাকে নিয়ে
সেখানে যাও ?

কোথায় ?

ওপারে মাছ ধরতে ?

ইন্দ্র ছিপটা তুলিয়ালইয়া সাবধানে পাশে রাখিয়া বলিল, আমি
আর যাইনে। তাহার কথা শুনিয়া ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।
কহিলাম, আর এক দিনও যাওনি ?

না, একদিনও না। আমাকে মাথার দিবিা দিয়ে—কথাটা
ইন্দ্র শেষ না করিয়াই ঠিক যেন থমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কে মাথার দিবিা দিলে ভাই ? তোমার
মা ?

না, মা নয়। বলিয়া ইন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে
ছিপের গায়ে সূতাটা ধারে ধারে জড়াইতে জড়াইতে কহিল,,
শ্রীকান্ত, আমাদের সে রাত্রির কথা তুই বাড়িতে বলে দিসনি ?

আমি বলিলাম, না। কিন্তু তোমার সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলুম,
তা সবাই জানে।

ইন্দ্র আর কোন প্রশ্ন করিল না। একটা শরের ডাঁটা
ছিঁড়িয়া নতমুখে জলের উপর নাড়িতে নাড়িতে কহিল, শ্রীকান্ত!

কি ভাই ?

তোর—তোর কাছে টাকা আছে ?

ক টাকা ?

ক টাকা ? এই ধরু পাঁচ টাকা—

আছে। তুমি নেবে ? বলিয়া আমি ভারি খুসি হইয়া

তাহার মুখপানে চাহিলাম। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দ্র কহিল, কিন্তু, আমি ত এখন তোকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

আমি আর চাইনে, বলিয়া সগর্বে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

আবার কিছুক্ষণ সে মুখ নীচু করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি নিজে চাইনে। একজনদের দিতে হবে, তাই। তারা বড় দুঃখী যে—খেতেও পায় না। তুই যাবি সেখানে? চক্ষের নিমেষে আমার সেই রাত্রির কথা মনে পড়িল। কহিলাম, সেই যাদের তুমি টাকা দিতে নেমে যেতে চেয়েছিলে? ইন্দ্র অশ্রুমনস্কভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, তারাই। টাকা আমি নিজেই ত কত দিতে পারি, কিন্তু দিদি যে কিছুই নিতে চায় না। তোকে একটবার যেতে হবে শ্রীকান্ত, নইলে এ টাকাও নেবে না; মনে করবে, আমি মায়ের বাক্স থেকে চুরি করে এনেচি! যাবি শ্রীকান্ত?

তারা বুঝি তোমার দিদি হয়?

ইন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, না, দিদি হয় না—দিদি বলি। যাবি ত? আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তখনি কহিল, দিনের-বেলা গেলে সেখানে ভয় নেই। কাল রবিবার; তুই ধেয়েদেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকিস, আমি নিয়ে যাব; আবার তখখুনি ফিরিয়ে আনব। যাবি ত ভাই? আমি দ্বিতীয়বার তাহার নৌকায় উঠিবার কথা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

কথা দিলাম সত্য, কিন্তু সে যে কতবড় দুঃসাহসের কথা, সে ত আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। পরদিন খাওয়া দাওয়া

শেষ হইলে, টাকা পাঁচটি লুকাইয়া লইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িলাম। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম শর-বাড়ের নীচে সেই ছোট নৌকাটির উপর ইন্দ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। সাবধানে ধীরে ধীরে নামিয়া নিঃশব্দে চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র নৌকা ছাড়িয়া দিল।

শ্মশানের সেই সঙ্কীর্ণ ঘাটের পাশে বটবৃক্ষ-মূলে ডিস্কি বাঁধিয়া যখন দুজনে রওনা হইলাম, তখনও অনেক বেলা ছিল। কিছু দূর গিয়া ডানদিকে বনের ভিতর ঠাহর করিয়া দেখায়, একটা পথের মতও দেখা গেল। ইন্দ্র তাহাই ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটা পর্ণকূটীর দেখা গেল। কাছে আসিয়া দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার পথ আগড় দিয়া আবদ্ধ। ইন্দ্র সাবধানে তাহার বাঁধন খুলিয়া ঠেলা দিয়া প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া লইয়া পুনরায় তেমন করিয়া বাঁধিয়া দিল। আমি তেমন বাসস্থান কখনো জীবনে দেখি নাই! একে ত চতুর্দিকেই নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড তৈঁতুল গাছ এবং পাকুড় গাছে সমস্ত যাদুগাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাড়া পাইয়া এক পাল মুরগি এবং ছানাগুলি চিৎকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটা-দুই ছাগল ম'্যা ম'্যা করিয়া ডাকিয়া উঠিল। স্মৃখে চাহিয়া দেখি—ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া-আঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। চক্ষের নিমিষে অশ্রুট চীৎকারে মুরগিগুলোকে আরও ত্রস্ত ভীত করিয়া দিয়া আঁচড়-পিঁচড় করিয়া একেবারে সেই বেড়ার উপর চড়িয়া বসিলাম।

ইন্দ্র খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ও কিছু বলে না রে, বড় ভালমন্মুখ। ওর নাম রহিম। বলিয়া কাছে গিয়া তাহার পেটটা ধরিয়া টানিয়া উঠানের ওধারে সরাইয়া দিল। তখন নামিয়া আসিয়া ডান দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই পর্ণ-কুটারের বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলা-গোছের লোক প্রবল কাসির পরে ঠাপাইতেছে। তাহার মাথার জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোট-বড় মালা। গায়ের জামা এবং পরণের কাপড় অশ্রান্ত মলিন এবং এক-প্রকার হলুদে রঙে ছোপানো। তাহার লম্বা দাড়ি বস্ত্রখণ্ড দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল বলিয়াই প্রথমটা চিনিতে পারি নাই; কিন্তু কাছে আসিয়াই চিনিলাম সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ-ছয় পূর্বে তাহাকে প্রায় সর্বত্রই দেখিতাম। আমাদের বাটীতেও তাহাকে কয়েকবার সাপ খেলাইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্র তাহাকে শাহজাঁ সন্মোদন করিল। তার পরে দুজনের যুহুর্কণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হইল। তাহার অধিকাংশ শ্রুতিতেও পাইলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, শাহজাঁ হিন্দিতে কথা কহিলেও ইন্দ্র বাঙলা ছাড়া কিছুই ব্যবহার করিল না।

শাহজাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা উন্মত্ত চিৎকারে পরিণত হইল। কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া সে যে এরূপ অকথা অশ্রাব্য গালি-গালজ উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা তখন বুঝিলে, ইন্দ্র সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি করিতাম না। তারপরে লোকটা বেড়ায় ঠেস্ দিয়া

বসিল এবং অনতিকাল পরেই ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল ।
দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসিয়া থাকিয়া যেন অস্থির হইয়া
উঠিলাম, বলিলাম, বেলা, যায় ; তুমি সেখানে যাবে না ?

কোথায় শ্রীকান্ত ?

তোমার দিক্‌কে টাকা দিতে যাবে না ?

দিদির জগুই ত ব'সে আছি । এই ত তাঁর বাড়ী ।

এই তোমার দিদির বাড়ী ! এরা ত সাপুড়ে—মুসলমান !
ইন্দ্র কি-একটা কথা বলিতে উদ্বৃত্ত হইয়াই, চাশিয়া গিয়া চুপ
করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল । তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বড়
বাথায় একেবারে যেন লান হইয়া গেল । একটু পরেই কহিল,
একদিন তোকে সব কথা বলব । সাপ খেলাব দেখবি শ্রীকান্ত ?

তাহার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম—তুমি সাপ খেলাবে
কি ? কামড়ায় যদি ? ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা
ছোট নাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশি বাহির করিয়া আনিল ; এবং
সুস্থে রাখিয়া ডালার বাঁধন আলগা করিয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল ।
আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম । ডালা খুলে না ভাই, ভেতরে
যদি গোখরো সাপ থাকে ! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও
আবশ্যক মনে করিল না ; শুধু ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে গোখরো
সাপই খেলাইবে ; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বাঁশী
বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল । সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখরো
একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল ; এবং মূহূর্ত্ত বিলম্ব
না করিয়া ইন্দ্র হাতের ডালায় একটা তাঁত ছোবল মারিয়া নাঁপি
হইতে বাহির হইয়া পড়িল । বাপ রে ! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে

লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চড়িয়া বসিলাম! ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশীর লাউয়ের আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল, এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়। ভয়ে, বিরক্তিতে রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল, বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে? ও বেরিয়ে যদি শাহজীকে কামড়ায়? ইন্দ্রর লজ্জার পরিসীমা ছিল না।

এই যে দিদি! এসো না, এসো না; ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্বী স্নান করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আট্টা বাঁধা কতকগুলি শুকনো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক-শব্জী। পরণে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামা কাপড়—গুরুয়া রঙে ছোপান, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। হাতে দুগাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দুস্থানীর মত সিঁদুরের আয়তি চিহ্ন। তিনি কাঠের বোঝাটা নামাইয়া রাখিয়া আগড়া খুলিতে খুলিতে বলিলেন, কি? ইন্দ্র মহাবাস্তব হইয়া বলিল, খুলো না দিদি, তোমার পারে পড়ি—মস্ত একটা সাপ ঘরে ঢুকেছে। তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। তার পরে একটুখানি হাসিয়া পরিষ্কার বাজালায় বলিলেন, তাই ত! সাপুড়ে ঘরে সাপ ঢুকেছে, এ ত বড় আশ্চর্য্য! কি বল শ্রীকান্ত? আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।—কিন্তু কি করে সাপ ঢুকল ইন্দ্রনাথ?

ইন্দ্র বলিল, ঝাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে বুনো সাপ। তুমি যেও না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে। শাহজীকে তুলে দাও—আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলিয়া ইন্দ্র ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

আমাকে খাবে না রে—এখুনি ধ'রে দিচ্ছি জ্বাখ! বলিয়া বাঁশের মাচা হইতে একটা কোরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

পাঁচ

ইন্দ্রর দিদি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া সন্তোষে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিলেন, ছি, দাদা, এমন কাজ আর কথ'খনো কোরো না। এ সব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা করতে আছে ভাই? ভাগে তোমার হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল, না হ'লে আজ কি কাণ্ড হ'ত বল ত?

আমি কি তেমনি বোকা দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্রতিভ হাসিমুখে ফস্ করিয়া তাহার কৌচার কাপড় টানিয়া ফেলিয়া কোমরে সূতা-বাঁধা কি একটা শুকনা শিকড় দেখাইয়া বলিল, এই জ্বাখ দিদি, আট-ঘাট বেঁধে রেখেছি কি না! এ না থাকলে কি আর আজ আমাকে না ছুবলে ছেড়ে দিত? শাহজীর কাছে এটুকু আদায় করতে কি আমাকে কম কষ্ট পেতে হয়েছে?

এ সঙ্গে থাকলে কেউ ত কামড়াতে পারেই না ; আর তাই যদি বা কামড়াতে—তাতেই বা কি ! শাহজীকে টেনে তুলে তক্ষণি বিষ-পাথরটি ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা দিদি, ঐ বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে ? আধ ঘণ্টা ? এক ঘণ্টা ? না অতক্ষণ লাগে না, না দিদি ?

দিদি কিন্তু তেমনি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দ্র উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল আজ দাও না দিদি আমাকে একটি। তোমাদের ত দুটো-তিনটে রয়েছে—আর আমি কতদিন ধরে চাইচি। আমাকে তোমরা যা বল, আমি তাই করি—আর তোমরা কেবল পট্টি দিয়ে আমাকে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—যদি নাই দেবে, তবে ব'লে দাও না কেন ? আমি আর আসব না—যাও।

ইন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে, তাঁর মুখখানি কিসের অপরিসীম বাথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল ! কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া একটুখানি হাসির ভাব আনিয়া কহিলেন, হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়ীতে শুধু সাপের মস্তুর আর বিষ-পাথরের জন্তেই আসিস্ রে ?

ইন্দ্র অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল, তবে না ত কি ! নিদ্রিত শাহজীকে একবার আড়-চোখে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, কিন্তু কেবলই আমাকে ভোগা দিচ্ছে—এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, সেই যে কবে শুধু হাতচালার মস্তুরটুকু দিয়েছিল, আর দিতেই চায় না। কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি, তুমিও

কম নয়, তুমিও সব জানো। ওকে আর আমি খোসামোদ কর্চিনে দিদি, তোমার কাছ থেকেই সমস্ত মস্তুর আদায় ক'রে নেব। হাঁ দিদি, তুমিও মড়া বাঁচাতে পারো ?

দিদি বলিলেন, আমি ত মড়া বাঁচাতে জানিনে ইন্দ্রনাথ !

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, তোমাকে এ মস্তুর শাহজী দেয়নি ? দিদি ঘাড় নাড়িয়া না বলিলে, ইন্দ্র মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, এ বিত্তে কি কেউ শিগ্গির দিতে চায় দিদি ! আচ্ছা, কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না ?

দিদি বলিলেন, কাকে কড়ি-চালা বলে, তাই ত জানিনে ভাই !

ইন্দ্র বিশ্বাস করিল না। বলিল, ইস্ ! জাননা বৈ কি ! দেবে না, তাই বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-চালা কখনো দেখেচিস শ্রীকান্ত ? দুটি কড়ি মস্তুর প'ড়ে ছেড়ে দিলে তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধ'রে, সাপটাকে দশদিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির ক'রে দেয়। এমনি মস্তুরের জোর ! আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধূলো-পড়া এ সব জান ত ? আর যদি নাই জানবে ত অমন সাপটাকে ধ'রে দেবে কি ক'রে ?

দিদি বলিলেন, ইন্দ্র, তোর দিদির এ সব কাণাকড়ির বিত্তেও নেই।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহজীর পিছনে ঘুরে বেড়িয়োনা। আমরা মন্ত্র-তন্ত্র

কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে ; কড়ি চেলে সাপ ধ'রে আনতে পারিনে । আর কেউ পারে কি না, জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই !

ইন্দ্র তুচ্ছ হইয়া কহিল, যদি পার না, তবে সাপ ধরলে কি ক'রে ?

দিদি বলিলেন, ওটা শুধু হাতের কৌশল ইন্দ্র, কোন মন্ত্রের জোরে নয় । সাপের মন্ত্র আমরা জানিনে ।

ইন্দ্র বলিল, যদি জান না, তবে তোমরা দুজনে জুচ্চুরি ক'রে ঠিকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন ? ঠগ্ জোচ্চোর সব—আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা ।

দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মত শাদা হইয়া গেল । সভয়ে সসঙ্কোচে বলিলেন, আমরা যে সাপুড়ে—ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা ।

বাবসা বার ক'রে দিচ্ছি—চল্ রে শ্রীকান্ত, জোচ্চোরদের ছায়া মাড়াতে নেই । হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা । বলিয়া ইন্দ্র সহসা আমার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান্ দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল ।

ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না ; কারণ তাহার অনেক দিনের অনেক বড় আশা একেবারে চোখের পলকে ভূমিসাৎ হইয়া গেল, জোর করিয়া ইন্দ্রর হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জগে এনেছিলাম দিদি—এই নাও ।

ইন্দ্র হৌ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা !

জুচ্চুরি ক'রে এরা আমার কাছে কত টাকা নিয়েচে, তা তুই জানিস্ শ্রীকান্ত ? এরা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক্, সেই আমি চাই !

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না ইন্দ্র, দাও—
আমি দিদির নাম ক'রে এনেচি—

ওঃ—ভারি দিদি ! বলিয়া সে আমাকে টানিয়া বেড়ার কাছে আনিয়া ফেলিল ।

এতক্ষণে গোলমালাে শাহজীর নেশার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ।
সে কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া ? বলিয়া উঠিয়া বসিল ।

ইন্দ্র আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকু ! রাস্তায় তোমাকে দেখতে পেলো চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব । কেয়া হুয়া ! বদমাস ব্যাটা কিচ্ছু জানে না—আর বলে বেড়ায় মস্তরের জোরে মড়া বাঁচাই ! কখনো পথে দেখা হ'লে এবার ভাল ক'রে বাঁচাব তোমাকে ! বলিয়া সে এমনি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যে শহজী চমকাইয়া উঠিল । কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিস্কার বাঙলা করিয়া ডাকিল, শোন ইন্দ্রনাথ, কি হয়েছে বল ত ? আমি তাহাকে এই প্রথম বাঙলা বলিতে শুনলাম ।

ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কিচ্ছু জান না—কেন মিছামিছি আমাকে ধোঁকা দিয়ে এতদিন এত টাকা নিয়েচ, তার জবাব দাও ।

সে কহিল, জানিনে, তোমাকে কে বললে ?

ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ দিদির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল,

ওই বললে, তোমার কাণা কড়ির বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আছে শুধু জুচ্চুরি করবার আর লোক ঠকাবার। এই তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যাবাদী চোর !

শাহজীর চোক দুটা ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে যে কি ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। লোকটা তাহার এলোমেলো জটাটা বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্তম্ভে আসিয়া কহিল, বলেচিস্ তুই ?

দিদি তেমনি নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। ইন্দ্র আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, রাত্তির হচ্ছে—চল্ না।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শাহজীর কণ্ঠস্বর আবার কানে আসিল—কেন বল্লি ?

প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইলাম না। আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অকস্মাৎ চারিদিকের সেই নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা তীব্র আন্তরিক পিছনের আঁধার কুটীর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কানে বিঁধিল ! এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অগুরূপ ঘটিল। স্তম্ভেই একটা শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড় ছিল ; আমি সবেগে গিয়া তাহারই উপরে পড়িলাম। কাঁটায় সর্বাস্ত্র ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। সে যাক্—কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেই প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এ কাঁটা ছাড়াই ত সে কাঁটায় কাপড় বাধে ; সে কাঁটা ছাড়াই ত আর একটা কাঁটায় কাপড় আটকায়।

যখন কোন মতে শাহজীর বাড়ীর ধারে গিয়া পড়িলাম, তখন দেখি, সেই প্রান্তেরই এক প্রান্তে দিদি মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে গুরু-শিষ্যের রিতিমত মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা পড়িয়া আছে।

শাহজী লোকটা অত্যন্ত বলবান। কিন্তু ইন্দ্র যে তাহার অপেক্ষাও কত বেশি শক্তিশালী, এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে বোধ হয় সে এত বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিত না। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া, তাহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। সে এমনি টিপুনি যে, আমি বাধা না দিলে হয় ত সে যাত্রা শাহজীর সাপুড়ে যাত্রাটাই শেষ হইয়া যাইত।

বিস্তর টানা-হাঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক্ করিলাম, তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্ধকারে প্রথমে নজর পড়ে নাই যে, তাহার সমস্ত কাপড় জামা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, গাঁজাখোর আমাকে সাপ-মারা বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরেচে—এই ছাখ্। জামার আস্তিন তুলিয়া দেখাইল, বাহুতে প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত এবং তাহা দিয়া অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে।

ইন্দ্র কহিল, কাঁদিস্নে—এই কাপড়টা দিয়ে খুব টেনে বেঁধে—এই খপরদার! ঠিক অম্নি ব'সে থাকো। উঠলেই গলায় পা দিয়ে তোমার জিভ টেনে বার করব—হারামজাদা শূয়ার! নে, তুই টেনে বাঁধ—দেরি করিস্নে। বলিয়া সে চড়্ চড়্ করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। আমি

কম্পিতহস্তে ক্ষতটা বাঁধিতে লাগিলাম এবং শাহজী অদূরে বসিয়া মুমূর্ষু বিষাক্ত সর্পের দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্র কহিল, না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন করতে পার। আমি তোমার হাত বাঁধব। বলিয়া তাহারই গেরুয়ারঙে ছোপানো পাগড়ি দিয়া টানিয়া টানিয়া তাহার দুই হাত জড় করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, সে বাঁধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্যান্ত কহিল না।

যে লাঠিটার আঘাতে দিদি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, কি নেমক্কারাম সয়তান এই ব্যাটা! বাবার কত টাকা যে চুরি ক'রে একে দিয়েছি, আরও কত হয়ত দিতাম, যদি না দিদি আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করত। আর স্বচ্ছন্দে ও ঐ বল্লমটা আমাকে ছুড়ে মেরে বসল! শ্রীকান্ত, নজর রাখ, যেন না ওঠে—আমি দিদির চোখে-মুখে জলের বাপটা দিই।

জলের বাপটা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, যেদিন থেকে দিদি বললে, ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হ'লে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের ইহকাল পরকাল মাটি করব না, সেই দিন থেকে ঐ সয়তান ব্যাটা দিদিকে কত মার মেরেচে, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে, ঘুঁটে বেচে খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে—তবু কিছুতে ওর হয় না। কিন্তু আমি ওকে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়ব—না হ'লে দিদিকে ও খুন ক'রে ফেলবে, ও খুন করতে পারে!

দিদি যখন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি বোধ

করি দ্বিপ্রহর ! আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া শাহজীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, শোও গে :

লোকটা ঘরে চলিয়া গেলে তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, ইন্দ্র, এই আমার মাথায় হাত দিয়ে শপথ কর্ ভাই, আর কখনো এ বাড়ীতে আসিসনে ! আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিসনে ।

ইন্দ্র প্রথমটা অবাক হইয়া রহিল । কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের মত জুলিয়া উঠিয়া বলিল, তা বটে । আমাকে খুন করতে গিয়েছিল, সেটা কিছু না । আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেছি, তাতেই তোমার এত রাগ ! এমন না হ'লে কলিকাল বলেচে কেন ? কিন্তু কি নেমকহারাম তোমরা দুজন ।—আয় শ্রীকান্ত আর না !

আমি অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সেই টাকা পাঁচটি খুঁটির কাছে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্রের অনুসরণ করিলাম । ইন্দ্র প্রাক্কণের বাহিরে আসিয়া চেষ্টাইয়া বলিল, হিঁদুর মেয়ে হ'য়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার ধর্ম্মকর্ম্ম ! চুলোয় যাও—আর আমি খোঁজ করব না, 'খবরও নেব না'—বলিয়া দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল ।

দুজনে নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্দ্র নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল ।

প্রায় শেষ রাত্রে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল । আমাকে নামাইয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, বাড়ী যা শ্রীকান্ত ! তুই বড় অপরাধ ! তোকে সঙ্গে নিলেই একটা-না-একটা ফাঁসাদ বাধে ।

আজ থেকে তোকে আর আমি কোন কাজে ডাকব না—তুইও আর আমার সামনে আসিস্নে। যা! বলিয়া সে গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হইয়া নির্জজন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছয়

তিন-চারি মাস কাটিয়াছে। উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করিয়াছি—তা বেদনা এক পক্ষের যত নিদারুণই হোক—কেহ কাহারও খোঁজ করি না।

দন্ডদের বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইতেছে। মেঘনাদবধ হইবে। ইতিপূর্বে পাঁড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশি চোখে দেখি নাই! সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়াও নাই, বিশ্রামও নাই। স্টেজ-বাঁধার সাহায্য করিতে পাইয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। স্মরণ্য ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধ বার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা

শ্রীমন্মের ঘরের সন্নিহিত দাঁড়াইয়া রহিলাম ; রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না । একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন ? অকৃতজ্ঞ রাম ! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে !

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা ‘বেল’ হইয়া গেলে, নিতান্ত ক্ষুধমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া স্তম্ভে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম । কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গেলাম । সে কি প্লে ! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না । মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড ! তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ । পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত । সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ী ছাড় উপায় নাই । অনেক দিনের কথা । আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই । কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না ।

ড্রপ-সিন উঠিয়াছে । বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন— অল্প স্বল্প বারত প্রকাশ করিতেছেন । এমন সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া স্তম্ভে আসিয়া পড়িল । সমস্ত ফেটজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া ছুলিয়া উঠিল—ফুটলাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া

ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল! তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্ত কেহ বা সভয় চাঁৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্ত চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইল না। বাঁ হাতের ধমুক ফেলিয়া দিয়া, পেণ্টুলানের মুট চাপিয়া ডানহাতের শুধু তাঁর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধনু বীর! ধনু বীর! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধমুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়—শুধু ডান হাত এবং শুধু তাঁর দিয়া কমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত! বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

আনন্দের সীমা নাই—মগ্ন হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্ত মনে মনে তাঁহার শতকোটি প্রশংসা করিতেছি, এমন সময়ে পিঠের উপর একটা আঙ্গুলের চাপ পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখি ইন্দ্র। চুপি চুপি কহিল, আয় শ্রীকান্ত, দিদি একবার তোকে ডাকছেন। তড়িৎস্পর্শের মত সোজা খাড়া হইয়া উঠলাম। কোথায় তিনি?

বেরিষে আয় না—লচি। পথে আসিয়া সে শুধু কহিল, আগার সঙ্গে আয়। বলিয়া চলিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাহার নৌকা বাঁধা আছে—নিঃশব্দে উভয়ে চড়িয়া বসিলাম, ইন্দ্র বাঁধন খুলিয়া দিল।

আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথবাহিয়া দুজনে শাহজীর

কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোধ করি রাত্রি আর বেশি নাই।

একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বলাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহজীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ লম্বা হইয়া আছে।

দিদি মুহূর্তে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃতি করিলেন। আজ-দুপুর-বেলা কাহার বাটীতে সাপ ধরিবার বায়না থাকে। সেখানে ঐ সাপটিকে ধরিয়া যাহা বক্সিস্ পায় তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাতল হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ী ফিরিয়া দিদির পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়। খেলাইয়াও ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাস্ত করিয়া তাহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পূরিবার সময় মদের ঝাঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে, সেও আদর করিয়া শাহজীর গলার উপর তাঁর চুম্বন দিয়াছে।

দিদি তাঁহার মলিন অঞ্চল-প্রান্তে চোখ মুছিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তখনই কিন্তু তাঁর চৈতন্য হ'ল যে, সময় আর বেশি নেই। বললেন, আয় তু নে এক সপ্তেট যাই, ব'লে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধরে দুই হাত দিয়ে ক'ক টেনে-টেনে ঐ অতবড় ক'রে ফেলে দিলেন। তার পরে দুজনেরই খেলা সাস্ত হ'ল।

একটুখানি স্থির থাকিয়া দিদি বলিলেন, তোমরা ছেলেনামুষ; কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই ভাই, তাই এই ভিক্ষে করি, এ'র একটু তোমরা উপায় করে দিয়ে যাও। আঙুল

দিয়া কুটারের দক্ষিণ-দিকের জঙ্গলটা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে একটু জায়গা আছে, ইন্দ্রনাথ, আমি অনেকদিন ভেবেচি, যদি আমার মরণ হয়, ওইখানেই যেন শুয়ে থাকতে পাই ! সকাল হ'লে সেই জায়গাটুকুতে এঁকে শুইয়ে রেখো ভাই, অনেক কষ্টই এ-জীবনে ভোগ ক'রে গেছেন—তবু একটু শান্তি পাবেন ।

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, শাহজীকে কি কবর দিতে হবে ?

দিদি বলিলেন, মুসলমান যখন, তখন দিতে হবে বই কি ভাই !

ইন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, দিদি, তুমিও কি মুসলমান ?

দিদি বলিলেন, হাঁ, মুসলমান বৈকি !

বাকি রাতটুকু কাটিয়া গেলে, ইন্দ্র সেই নির্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়িয়া আসিল এবং তিনজনে আমরা ধরাধরি করিয়া শাহজীর মৃতদেহটা সমাহিত করিলাম । গঙ্গার ঠিক উপরেই কাঁকরের একটুখানি পাড় ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন কাহারও শেষ-শয্যা বিছাইবার জগুই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল । কুড়ি পঁচিশ হাত নীচেই জাহ্নবী-মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বহুলতার আচ্ছাদন । প্রিয়বস্তুর সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে ।

ইহাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ঘকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা ! আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই । ইন্দ্র বলিয়া উঠিল, দিদি, আমার কাছে তুমি চল—আমার মা এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তোমাকে ফেলবেন না—কোলে টেনে নেবেন । তাঁর বড় মায়ার

শরীর, একবার শুধু তাঁর কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চল। তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।

এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন যে, শাহজী তাঁর স্বামী ছিলেন। ইন্দু কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সন্দিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি।

দিদি বলিলেন, হাঁ বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইন্দু ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া কহিল, জাত দিলেন কেন ?

দিদি বলিলেন, সে কথা ঠিক জানিনে ভাই ! কিন্তু তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বই ত নয়। নইলে আমি নিজে হ'তে জাতও দিইনি—কোন দিন কোন অনাচারও করিনি।

ইন্দু গাঢ়স্বরে কহিল, সে আমি দেখেছি দিদি—আমাদের বাড়ীতে তোমাকে যেতেই হবে দিদি, এখন চল।

দিদি মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে ইন্দুনাথ !

কেন পার না দিদি ?

দিদি বলিলেন, আমি জানি, তিনি কিছু কিছু দেন। রেখে গেছেন। সেগুলি শোধ না দেওয়া পর্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।

ইন্দু হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—সে আমিও জানি ! তাড়ির দোকানে, গাঁজার দোকানে তার দেনা ; কিন্তু তোমার তাতে কি ?

কার সাধ্য তোমার কাছে টাকা চাইতে পারে ? তুমি চল আমার সঙ্গে, কে তোমায় আটকায় দেখি একবার ।

অত দুঃখেও দিদি একটুখানি হাসিলেন । বলিলেন, ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক ক'রে রাখবে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম । স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ ! সে পাওনাদারকে তুমি কি ক'রে বাধা দেবে ভাই ! তা হয় না । আজ তোমরা বাড়ী যাও—আমার অল্ল-স্বল্প যা কিছু আছে বিক্রী ক'রে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি । কাল-পরশু একদিন এসো ।

আমি এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই ছিলাম । এইবার কথা কহিলাম । বলিলাম, দিদি, আমার কাছে বাড়ীতে আরও চার-পাঁচটা টাকা আছে—নিয়ে আসব ? কথাটা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ছোট ছেলেটির মত একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, আমার কপালের উপর তাঁহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া, মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, না দাদা, আর এনে কাজ নেই । তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দয়া আমি মরণ পর্য্যন্ত মনে রাখব ভাই । আশীর্বাদ ক'রে যাই, তোমার বুকের ভিতরে ব'সে ভগবান চিরদিন যেন অমনি ক'রে দুঃখীর জনো চোখের জল ফেলেন । বলিতে বলিতেই তাঁহার দুচোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল ।

বেলা আটটা-নয়টার সময় আমরা বাটীতে ফিরিতে উদ্ভত হইলে, সেদিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিলেন । যাবার সময় ইন্দ্রের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করি, সে সাহস

আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাহিরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে মনে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার ক'রে নেন।

ইন্দ্রকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাধা দেওয়া সহ্যও ইন্দ্র জোর করিয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কঁাদ কঁাদ হইয়া বলিল, দিদি, এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতে মন সরচে না। আমার কি জানি কেন কেবলি মনে হচ্ছে, তোমাকে আর দেখতে পাব না।

দিদি জবাব দিলেন না—সহসা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সেই বনপথ ধরিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন শৃণু কুটীরে ফিরিয়া গেলেন।

তিনদিন পরে স্কুলের ছুটির পর বাহির হইয়াই দেখি, ইন্দ্র গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলায় ভরা। এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। বড়লোকের ছেলে, বাহিরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি ত দেখিই নাই—বোধ করি আর কেহও দেখে নাই। ইসারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ইন্দ্র বলিল, দিদি নেই—কোথায় চ'লে গেছেন। কাল থেকে আমি কত জায়গায় ঘে খুঁজিচি, কিন্তু দেখা পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, এই নে, বলিয়া একখানা ভাঁজকরা হলুদে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে আর একদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সেইখানেই আমি ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভাঁজ খুলিয়া কাগজখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরলাম। চিঠিতে লেখা ছিল, শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্বাদ করিতেছি। শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের আশীর্বাদ করিব। কিন্তু আমার জ্ঞান তোমরা দুঃখ করিও না। ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, সে জানি; কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস্ত করিয়ো। কেন জানিনা আমার এই অন্তবিহীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানাইয়া কোন মতেই বিদায় লইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অন্নদা। স্বামীর নাম কেন গোপন করিয়া গেলাম, তাহার কারণ—এই লেখাটুকু শেষ পর্য্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্ম বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন—ইহাকেই হত্যা করিয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হন। এ দুর্কর্ম কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলে মানুষ আজ না বুঝিতে পারিলেও একদিন বুঝিবে। তার পরে সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতে ছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই।

শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্মই করিয়াছিলেন । কিন্তু সে মিছে কথা । তবুও একদিন গভীর রাত্রে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আমার স্বামীর জন্মই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম । কিন্তু সবাই শুনিল, সবাই জানিল, অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে । এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে । কোন উপায় নাই । কারণ স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই—পিতাকে চিনিতাম ; তিনি কোন মতেই তাঁর সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেন না । কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁহাকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে ? স্মৃতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই । তা ছাড়া আমি মুসলমানী ।

এখানে স্বামীর ঋণ যাহা ছিল, পরিশোধ করিয়াছি । আমার কাছে লুকোনো দুটি সোণার মাকড়ি ছিল, তাহাই বেচিয়াছি । তুমি যে পাঁচটি টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই । আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের উপর যে মুদীর দোকান আছে, তাহার কর্তার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—চাহিলেই পাইবে । মনে দুঃখ করিয়ো না ভাই । আমার ভাই দুটি, তোমাদের আমি কি বলিয়া যে আশীর্বাদ করিব, খুঁজিয়া পাই না । তবে শুধু এই বলিয়া যাই—তোমাদের বন্ধুগণ যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন ।

—তোমাদের দিদি

অন্নদা

সাত

আজ একাকী গিয়া মুদীর কাছে দাঁড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া মুদী একটি ছোট ন্যাকড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দুটি সোনার মাকড়ি এবং পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকা কয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, বহু মাকড়ি দুইটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রী করিয়া শাহজীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না। যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা ছিল। অর্থাৎ বাইশটি মাত্র পয়সা অবলম্বন করিয়া এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারে স্নহুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন।

তার পরে অনেক দিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙ্গি কূলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আর একটি দিনমাত্র আমরা উভয়ে সেই নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ। তার পরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে।

সেদিন কনকনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব একপশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন হুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল,—তে ধিয়েটার হবে, বাবি ? ধিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শিগ্গির আমাদের বাড়ী আয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা রূপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম।

সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ীর গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গায় উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয় ত বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে; দেরি হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া, পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দের নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। তাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিন্ধের মোজা, চক্চকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোট মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত ‘যাচ্ছেতাই’ বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দের কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কি রে ?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী—কান্ত—! শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ্। ইন্দ্র, হাঁকো-কল্কে রাখনি কোথায় ? ছোঁড়াটাকে দে—তামাক সাজুক !

ওরে বাবা ! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না ! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজ্‌চি ।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম । কারণ, তিনি ইন্দ্রর মাসুত ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল-এ পাশ করিয়াছেন । কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল । তামাক সাজিয়া ছাঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্ন-মুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস্ কোথায় রে কান্ত ? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কি রে ? র‍্যাপার ? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী ? তেলের গন্ধে ভূত পালায় । ফুঁটচে—পেতে দে দেখি, বসি ।

আমি দিচ্ছি নতুনদা । আমার শীত কর্‌চে না—এই নাও ; বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল । তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন ।

শীতের গঙ্গা । অধিক প্রশস্ত নয়—আধঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল !

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা, এ যে ভারি মুকিল হ'ল, হওয়া প'ড়ে গেল । আর ত পাল চলবে না ।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক । কলিকাতাবাসী নতুতদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ স্নান হাসিয়া কহিল, দাঁড় ! কারুর সাধা নেই নতুনদা, এই রेत ঠেলে উজোন বয়ে যায় । আমাদের ফির্তে হবে !

প্রস্তাব শুনিয়া নতুনদা একমুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা

হইয়া উঠিলেন, তবে আন্লি কেন হতভাগা ? যেমন ক'রে হোক, তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়ম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ ক'রে ধরেচে। ইন্দ্র কহিল, তাদের বাজাবার লোক আছে নতুনদা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না ! আটকাবে না ? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়ম ! চল, যেমন ক'রে পারিস্ নিয়ে চল। বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু সে কথার প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রর অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ইন্দ্র, গুণটেনে নিয়ে গেলে হয় না ? কথটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁত-মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজিও মনে করিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে। জানোয়ারের মত ব'সে থাকা হচ্ছে কেন ?

তার পরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্ত নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁকে হালটা ধরিতে বলায়, জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা ধুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করতে পারবেন না।

বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে-চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রাম চেষ্টামেচি করিয়া লুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ—গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্বেক হইল; এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দুটা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ইন্দ্র, এদিকে খোঁটামোঁটাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?

ইন্দ্র কহিল, সাম্নেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুনদা। সব জিনিষ পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐঃ—টান্ না একটু জোরে—ভাত থা.স্ নে? ইন্দ্র, বলনা তোর ওই ওটাকে, একটু জোর ক'রে টেনে নিয়ে চলুক।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন

চলিতেছিলাম, তেমনি ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়টা ঢালু ও বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সন্ধীর জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, হাত-পা একটু খেলানো চাই! নাবা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র-সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ বুঝিয়াছিলাম, এতরাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহাৰ্য্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিস্তার ছিল না। অথচ তাঁর একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, চল না নতুনদা, একলা তোমার ভয় করবে—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।

নতুনদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ভয়! আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করিনে তা জানিস্! কিন্তু তা ব'লে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটারদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁর ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম

যে, ইন্দ্র আভাস দিলেও, আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজী হইলাম না। ইন্দ্রর সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জিতপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন—ঠুন-ঠুন পেয়াল।—

আমরা অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি-সুরে সঙ্গীতচর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, এরা কলকাতার লোক কিনা, জল-হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝলি না শ্রীকান্ত!

আমি বলিলাম, হঁ।

ইন্দ্র তখন—তিনি যে অচিরেই বি-এ পাশ করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি, কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত স্তব্ধাতি শুনিতে পাই কি করিয়া?

কিন্তু ভগবানও বোধকরি তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এ অঞ্চলে পথ-ঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদীর দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ইহার অল্পরোগী, নিষ্কর্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত, কষ্টাদায়গ্রস্ত বাঙালী গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমাইতে জানে।

দিনের-বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার ‘চারপাই’ আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চৈচামেচি ও দোর-নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথ বধের পরিবর্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা-পাপে দণ্ড হইয়া মরিতে হইত, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া, এবং যত প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া আধঘণ্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! ‘দর্জিপাড়া’র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দুজনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—নতুনদা! কিন্তু কোথায় কে! বাকুল আস্থান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ ‘হুড়ারে’র জ্বালায় সময়ে সময়ে বাতিবাস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে! ভয়ে সর্বস্ব কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু অতবড় অভিশাপ ত দিই নাই!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছু দূরে বালুর উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া

দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সু'র একপাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল—শ্রীকান্ত রে! আমার মাসিমাও এসেছেন যে। আমি আর বাড়ী ফিরে যাব না। তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদার দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার বার্থ প্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন এই দিকের কুকুরগুলোও যে সমবেত আর্ন্ত-চীৎকারে আমাদেরিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার বার্থ-প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। স্তত্রাং আর সংশয়মাত্র রহিল না যে, নেকড়েগুলো তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশে-পাশে দাঁড়াইয়া সেগুলো এখনও চঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি যাব। আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—পাগল হয়েচ ভাই! ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ-হাতে লইয়া কহিল, তুই থাক শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়ীতে খবর দিস—আমি চল্লুম।

তাহার মুখ অত্যন্ত পাগুর, কিন্তু চোখ-দুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক, শূন্য আশ্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দুটো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দস্ত মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না—সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চির-

অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কি বলিয়া বাধা দিব! যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না— আমিও যা হোক একটা হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্ভত হইলাম। এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, তুই কেপেচিস্ শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মুহূর্ত্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোন মতে গোপন করিয়া বলিলাম, তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমি বা কেন যাবে?

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নোকায় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও নতুনদাকে আন্তে চাইনি। কিন্তু, একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।

পূর্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীত ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাদবিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। ইন্দ্র কহিল, বালির ওপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার, সে চেষ্টা করিস্নে—জলে গিয়ে পড়বি।

সম্মুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে; যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া, বাঘ ত দূরের কথা, একটা শূগলও নাই। সম্ভরণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা

কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা।

নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অবাক্‌স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—এই যে আমি।

দুজনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম ; কুকুরগুলা সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র কাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে, সেই যে তিনি হাততালি দিয়া ‘ঠুন-ঠুন পেয়ালা’ ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীত-চর্চাতেই আকণ্ঠ হইয়া গ্রামের কুকুরগুলা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোষাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে কাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন ; এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাতে তুষার-শীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্দ্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাওয়া তাঁহাকে চান্স করিয়া তুলিতেও, সে রাতে আমরাগকে কম মেহমত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, বাবু ডাকায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একপাটি পাম্প ?

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত

দুঃখ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্ত সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্ত গলাবন্ধের জন্ত, মোজার জন্ত, দস্তানার জন্ত, একে একে পুনঃ পুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফিঁরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্বোধের মত সে সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে ত ধূলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এ সব কখনো চোখে দেখি নাই—এই সমস্ত অবিশ্রাম বকিতে বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্বের একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামাকাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দুটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে রাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্বের মুর্চ্ছিত হইতে ছিলেন, সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে করিতে—ইন্দুর খানি পরিধান করিয়া তিনি সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। বাই হৌক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্র-কবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া

গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া আজ নৌকাচড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্ভজ্য শীতের রাত্রে কৌচার খুঁটমাত্র অবলম্বন করিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।

বহুকাল পরের কথা। এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে তাঁর শিকার-পার্টিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এঁর সঙ্গে অনেকদিন স্কুলে পড়িয়াছি, গোপনে অনেক আঁক কষিয়া দিয়াছি—তাই তখন ভারি ভাব ছিল। তার পরে এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে ছাড়াছাড়ি। রাজার ছেলেদের স্মৃতিশক্তি কম, তাও জানি। কিন্তু ইনি যে মনে করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শুরু করিবেন, ভাবি নাই। মাঝে হঠাৎ একদিন দেখা। তখন সবে সাবালক হইয়াছেন। অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে এবং তার পরে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ছেলের কানে গিয়াছে—অতিরঞ্জিত হইয়াই গিয়াছে—রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই; এবং আরও এতপ্রকারের গুণগ্রামে ইতিমধ্যে মগ্নিত হইয়া উঠিয়াছি যে, একমাত্র সাবালক রাজপুত্রেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবার আমি উপযুক্ত। শাস্ত্রকারেরা বলেন, রাজা-রাজড়ার সাদর আহ্বান কখনো উপেক্ষা করিবে না। হিঁদুর ছেলে, শাস্ত্র অমান্য করিতে ত আর পারি না। কাজেই গেলাম। স্টেশন হইতে দশ-বার ক্রোশ পথ গজপৃষ্ঠে গিয়া দেখি, হাঁ, রাজপুত্রের সাবালকের লক্ষণ বটে। গোটা পাঁচেক তাঁবু পড়িয়াছে। একটা তাঁর নিজস্ব, একটা বন্ধুদের, একটা ভৃত্যদের, একটায় খাবার বন্দোবস্ত। আর একটা অমনি একটু দূরে—সেটা ভাগ করিয়া জন দুই বাইজী ও তাঁদের সান্নোপাদদের আড্ডা।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপুত্রের খাস-কামরায় অনেককণ হইতেই যে সঙ্গীতের বৈঠক বসিয়াছে, তাহা প্রবেশ-মাত্রই টের পাইলাম।

আমি প্রবেশ করিতেই গানটা থামিয়া গিয়াছিল। রাজপুত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান ফরমাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমটা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু অল্প কিছুকণেই বুঝিলাম, এই সঙ্গীতের মজলিসে আমিই যা-হোক একটু ব্যাপ্সা দেখি, আর সবাই ছুঁচোর মত কাণা।

বাইজী পাটনার লোক—নাম পিয়ারী। সে রাত্রে সে যেমন করিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া গান শুনাইয়াছিল, বোধ করি এমন আর সে কখনও শুনায় নাই। মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। গান থামিলে আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—বেশ! পিয়ারী দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

সকালে সোর-গোল করিয়া কুমারজী শিকারে বাহির হইলেন। সঙ্গে জন-দশেক শিকারী অনুচর। বন্দুক পনরটা—তার মধ্যে ছয়টা রাইফেল। স্থান—একটা আধশুকনা নদীর উভয় তীর! এপারে গ্রাম, ওপারে বালুর চর। এপারে ফ্রেশ ব্যাপিয়া বড় বড় শিমূলগাছ, ওপারে বালুর উপর স্থানে স্থানে কাশ ও কুশের ঘোপ। এইখানে এই পনরটা বন্দুক লইয়া শিকার করিতে হইবে। শিমূলগাছে-গাছে ঘুঘু গোটা-কয়েক দেখিলাম, মরা নদীর বাঁকের কাছটায়ও দুটো চকাচকি ভাসিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

কে কোন্ দিকে যাইবেন, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরামর্শ

করিয়া লইলেন। আমি বন্দুক রাখিয়া দিলাম। শিকারের ক্ষেত্র দেখিয়া সর্বান্ত জ্বলিয়া গেল।

কুমার প্রশ্ন করিলেন, কি হে কান্ত, তুমি বড় চুপচাপ ? ও-
কি, বন্দুক রেখে দিলে যে !

আমি পাখী মারি না।

সে কি হে ? কেন কেন ?

আমি গৌফ ওঠবার পর থেকে আর ছুরা দেওয়া বন্দুক
ছুঁড়িনি—ও আমি ভুলে গেছি।

কুমারসাহেব হাসিয়াই খুন।

সূর্যূর চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ! তিনিই এ দলের
প্রধান শিকারী এবং রাজপুত্রের প্রিয় পার্শ্বচর। তাঁহার অব্যর্থ
লক্ষ্যের খ্যাতি আমি আসিয়াই শুনিয়াছিলাম। রুম্ভ হইয়া
কহিলেন, চিড়িয়া শিকারমে কুছ সরম হ্যায় ?

আমারও মেজাজ তত ভাল ছিল না ; স্তূতরাং জবাব দিলাম,
সবাইকার নেহি হ্যায়, কিন্তু আমার হ্যায় ! যাক্ আমি তাঁবুতে
ফিরিলাম—কুমারসাহেব, আমার শরীরটা ভাল নেই, বলিয়া
ফিরিলাম। ইহাতে কে হাসিল, কে চোখ ঘুরাইল, কে মুখ
ভ্যাঙাইল, তাহা চাহিয়াও দেখিলাম না।

তখন সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরিয়া ফরাসের উপর চিৎ হইয়া
পড়িয়াছি, এবং আর-এক পেয়াল চা আদেশ করিয়া একটা
সিগারেট ধরাইয়াছি, যেয়ারা আসিয়া সসন্ত্রমে জানাইল, বাইজী
একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সাক্ষাৎ
করিতে চায় ?

তা জানিনে ।

তুমি কে ?

আমি বাইজীর খান্সামা ।

তুমি বাঙ্গালী ?

আজ্ঞে হাঁ—পরামণিক । নাম রতন ।

বাইজী হিন্দু ?

রতন হাসিয়া বলিল, নইলে থাক্বে কেন বাবু ?

আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তাঁবুর দরজা দেখাইয়া দিয়া রতন সরিয়া গেল । পদ্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, একখণ্ড মূল্যবান কাপেটের উপর গরদের শাড়ী পরিয়া বাইজী বসিয়া আছে । আমাকে দেখিয়া কহিল, শিকারে গিয়েছিলে, হঠাৎ ফিরে এলে যে ?

ভাল লাগলো না ।

না লাগ্‌বারই কথা । কি নিষ্ঠুর এই পুরুষমানুষ জাতটা । অনর্থক জীবহত্যা ক'রে কি আমোদ পায়, তা তারাই জানে । বাবা ভাল আছেন ?

বাবা মারা গেছেন ।

মারা গেছেন ! মা ?

তিনি আগেই গেছেন ।

ওঃ—তাইতেই, বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল । পরক্ষণেই কহিল, তা হ'লে যত্নতত্ত্ব করবার আর কেউ নেই, বল । পিসিমার ওখানেই আছ ত ? নইলে আর থাক্বেই বা কোথায় ? বিয়ে হয়নি, সে ত

গিয়াছিল। শ্রান্ত হইয়া বাইজী গান থামাইয়াছে, হঠাৎ গল্পের সেরা গল্প—ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। নিমিষে, যে যেখানে ছিল, আগ্রহে বক্তাকে ঘেরিয়া ধরিল।

প্রথমটা আমি তাচ্ছিল্যভরেই শুনিতেছিলাম। কিন্তু শেষে উৎগ্রীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন, একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক। গল্প কেমন করিয়া বলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, প্রেত-যোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে—যেন আজিকার এই শনিবার অমাবস্তা তিথিতে, এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন লোকই হোন, এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রে মহাশ্মশানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার ঘোর রাত্রে এই শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়; তাহার কণ্ঠস্বর শুনা যায়, এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথাবার্তা পর্য্যন্ত বলা যায়। আমি ছেলে-বেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে আসুন। আমি নিকটে সরিয়া গেলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না?

না।

কেন করেন না? না করার বিশেষ কোন হেতু আছে?

না।

তবে? এই গ্রামেই এমন দুই-একজন সিদ্ধ সাধক আছেন, যাঁরা চোখে দেখেছেন। তবুও যে আপনারা বিশ্বাস করেন না,

মুখের উপর হাসেন, সে শুধু দুপাতা ইংরিজি পড়ার ফল। বিশেষতঃ বাঙালারা ত নাস্তিক—শ্লেচ্ছ। কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল দেখিয়া, আমি অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম, দেখুন এ সম্বন্ধে আমি তর্ক করতে চাই নে। আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমি নাস্তিকই হই, শ্লেচ্ছই হই, ভূত মানিনে। যাঁরা চোখে দেখেচেন বলেন—হয় তাঁরা ঠেকেচেন, না হয় তাঁরা মিথ্যাবাদী—এই আমার ধারণা।

ভদ্রলোক খপ্প করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আপনি আজ রাত্রে শ্মশানে যেতে পারেন? আমি হাসিয়া বলিলাম, পারি। আমি ছেলে-বেলা থেকে অনেক শ্মশানেই অনেক রাত্রে গেছি।

বৃদ্ধ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, আপু সেখি মং করো বাবু, বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া, এই শ্মশানের মহা ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। এ শ্মশান যে, যে-সে স্থান নয়, ইহা মহাশ্মশান, এখানে সহস্র নরমুণ্ড গণিয়া লইতে পারা যায়, এ শ্মশানে মহা-ভৈরবী তাঁর সান্নিধ্য লাভ করিয়া প্রত্যহ রাত্রে নরমুণ্ডের গোপুয়া খেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন; তাঁহাদের খল্ খল্ হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিখ্যাসী ইংরাজ, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও হৃদস্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—এমনি সব লোমহর্ষণ কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে দিনের-বেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পিয়ারী কোন্ এক সময়ে কাছে

ঘোঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছে এবং কথাগুলো যেন সর্ববাক্য দিয়া গিলিতেছে।

এইরূপে এই মহাশ্মশানের ইতিহাস যখন শেষ হইল, তখন বক্তা গর্বভরে আমার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেয়া বাবুসাহেব আপু যায়েগা ?

যায়েগা বৈকি।

যায়েগা ? আচ্ছা, আপুকা খুসি। প্রাণ জানেসে—

আমি হাসিয়া বলিলাম, না বাবুজী, না। প্রাণ গেলেও তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না, তোমার ভয় নেই। কিন্তু অজানা যায়গায় আমিও শুধু হাতে যাব না—বন্দুক নিয়ে যাব। আমি পাখী মারিতে পারি না, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ভূত মারিতে পারি ; বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুশাস্ত্র মানে না ; তাহারা মুরগী খায় ; তাহারা মুখে যত বড়াই করুক, কার্যকালে ভাগিয়া যায় ; তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদের দাঁত-কপাটি লাগে— এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলে আমাদের রাজা-রাজড়াদের আনন্দোদয় হয় এবং তাহাদের মস্তিষ্কে অতিক্রম করিয়া যায় না—অর্থাৎ তাহারাও দুকথা কহিতে পারেন, সেই সব কথাবার্তা।

ইহাদের দলে একটিমাত্র লোক ছিল, যে স্বীকার করিয়াছিল, সে শিকার করিতে জানে না ; তাহার নাম পুরুষোত্তম। সে সন্ধার সময় আসিয়া আমাকে ধরিল—সঙ্গে যাইবে। কারণ ইতিপূর্বে সেও কোনদিন ভূত দেখে নাই। অতএব আজ যদি

এমন সুবিধা ঘটয়াছে, তবে ত্যাগ করিবে না ; বলিয়া খুব হাসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ভূত মান না ?

একেবারে না।

কেন মান না ?

মানি না, নেই ব'লে, এই বলিয়া সে প্রচলিত তর্ক তুলিয়া বারংবার অস্বীকার করিতে লাগিল। আমি কিন্তু অত সহজে তাহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলাম না। কারণ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছিলাম, এ সকল নুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়—সংস্কার। বুদ্ধি দিয়া যাহারা একেবারেই মানে না, তাহারাও ভয়ের জায়গায় আসিয়া পড়িলে ভয়ে নৃচ্ছা যায়।

পুরুষোত্তম কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে মালকোঁচা মারিয়া পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আপনার ইচ্ছা হয় বন্দুক নিন্, কিন্তু আমার হাতে লাঠি থাক্তে ভূতই বল আর প্রেতই বল, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেব না।

কিন্তু সময়ে, লাঠি হাতে থাক্বে ত ?

ঠিক থাক্বে বাবু, আপনি তখন দেখে নেবেন ! এক ফ্রোশ পথ—রাত্রি এগারটার মপোই রওনা হওয়া চাই।

দেখিলাম তাহার আগ্রহটা যেন একটু অতিরিক্ত।

যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টা-খানেক বিলম্ব আছে। আমি তাঁবুর বাহিরে পায়চারি করিয়া এই ব্যাপারটাই মনে মনে আন্দোলন করিয়া দেখিতেছিলাম—জিনিসটা সম্ভবতঃ কি হইতে পারে। সহসা সম্মুখের এই দুর্ভেদ্য অমাবস্তার অন্ধকারের পানে

চাহিয়া আমার আর একটা অমা-রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল ।
সে দিনটাও এমনি শনিবারই ছিল ।

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বের আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী
নিরুদ্দিদি যখন সূতিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়া নরেন, তখন সেই
মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না । বাগানের মধ্যে
একখানি মাটির ঘরে তিনি একাকিনী বাস করিতেন । সকলের
সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা,
নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না ।
কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, সূচের কাজ শিখাইয়া,
গৃহস্থালীর সর্বপ্রকার দুরূহ কাজকর্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ
করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই । একান্তশ্রদ্ধা, শান্তস্বভাব
এবং স্তূর্ণিমূল চরিত্রের জন্ত পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম
ভালবাসিত না ।

আমার পিসিমা যে অত্যন্ত সন্তোষে তাহাকে সাহায্য
করিতেন, এ কথা আমি এবং বাটীর বুড়া ঝি ছাড়া আর জগতে
কেহই জানে না । পিসিমা একদিন দুপুর-বেলা আমাকে নিভৃত
ডাকিয়া বলিলেন, বাবা শ্রীকান্ত, তোরা ত এমন অনেকেরই রোগে
শোকে গিয়ে দেখিস্ ; এই ছুঁড়িটাকে এক-আধবার গিয়ে দেখিস্
না । সেই অবধি আমি মাঝে মাঝে গিয়া দেখিতাম এবং পিসিমার
পয়সায় এটা—ওটা—সেটা কিনিয়া দিয়া আসিতাম । তাঁর শেষ-
কালে একা আমিই কাছে ছিলাম । মরণকালে অমন পরিপূর্ণ বিকার
এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান আমি আর দেখি নাই । বিশ্বাস না করিলেও
যে ভয়ে গা হুম্ হুম্ করে, আমি সেই কথাটাই বলিতেছি ।

সেদিন শ্রাবণের অমাবস্তা। রাত্রি বারোটোর পর ঝড় এবং জলের প্রকোপে পৃথিবী যেন উপড়াইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ; আমি খাটের অদূরে বহু প্রাচীন অর্দ্ধভগ্ন একটা ইজি চেয়ারে শুইয়া আছি। নিরুদ্দিদি স্নাত্তিক মুক্তকণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া হাত তুলিয়া আমার কানটা, তাঁর মুখের কাছে আনিয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তুই বাড়ী যা।

সে কি নিরুদ্দি, এই ঝড়-জলের মধ্যে ?

তা হোক! প্রাণটা আগে। ভুল বকিতেছেন ভাবিয়া বলিলাম, আচ্ছা যাচ্ছি—জলটা একটু থামুক। নিরুদ্দিদি ভয়ানক বাস্তব হইয়া বলিয়া উঠিলেন, না, না, শ্রীকান্ত, তুই যা। যা ভাই যা—আর এতটুকু দেরি করিসনে—তুই পালা। এইবার তাঁর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে আমার বুকের ভিতরটায় ঢাৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম আমাকে যেতে বলছ কেন ?

প্রত্যুত্তরে তিনি আমার হাতটা টানিয়া লইয়া রুদ্ধ জানালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া টেচাইয়া উঠিলেন, যাবিনি, তবে কি প্রাণটা দিবি ? দেখ্‌চিসনে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্তে কালো কালো সেপাই এসেচে ? তুই আছিস্ বলে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে শাসাচ্ছে ?

তার পরে সেই যে শুরু করিলেন—ঐ খাটের তলায় ! ওই মাথার শিয়রে ! ওই মারতে আসচে ! ওই নিলে ! ওই ধরলে ! এ চীৎকার শুধু থামিল শেষরাত্রে, যখন প্রাণটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

ব্যাপারটা আজও আমার বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া আছে। সে রাত্রে ভয় পাইয়াছিলাম ত বটেই। বোধ করি বা যেন কি সব চেহারাও দেখিয়াছিলাম। এখন মনে করিয়া হাসি পায় সত্য ; কিন্তু সেদিন অমাবস্তার ঘোর দুর্ঘোষ তুচ্ছ করিয়াও, বোধ করি বা ছুটিয়া পলাইতাম, যদি না এ কথা অসংশয়ে বিশ্বাস হইত—কপাট খুলিয়া বাহির হইলেই নিরুদ্দিদের কালো কালো সেপাই-সান্ত্রির ভিড়ের মধ্যে গিয়া পড়িব। অথচ এ সব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও জানিতাম ; মুমূর্ষু যে কেবলমাত্র নিদারুণ বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলাম।

বাবু ?

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, রতন।

কি রে ?

বাইজী একবার প্রণাম জানাচ্ছেন।

যেমন বিস্মিত হইলাম, তেমনি বিরক্ত হইলাম।

রতন সুশিক্ষিত ভূত্য : আদব-কায়দায় পাকা। সম্ভ্রমের সহিত মুহূর্তের কহিল, বড় দরকার বাবু, এখনি একবার পায়ের ধূলা দিতে হবে। নইলে বাইজীই আসবেন বল্লেন। বলিলাম, তুমি বুঝিয়ে বলগে রতন, আজ নয়, কাল সকালেই দেখা হবে। আজ আমি কোন মতেই যেতে পারব না।

রতন কহিল, তা হ'লে তিনিই আসবেন। আমি এই পাঁচ বছর দেখে আস্চি বাবু, বাইজীর কোন দিন কখনো এতটুকু কথার নড়-চড় হয় না। আপনি না গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

এই অশ্রায় অসঙ্গত জিদ দেখিয়া পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত ছলিয়া গেল। বলিলাম, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আসচি। তাড়াতাড়ি বুটটা পরিয়া লইয়া একটা কোট গায়ে দিয়া ফেলিলাম। রাইফেল ঠিক করাই ছিল। হাতে লইয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর তাঁবুতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। পিয়ারী স্নমুখেই দাঁড়াইয়া ছিল। ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, শ্যশানে-টশানে, তোমার কোন মতেই যাওয়া হবে না—কোন মতেই না।

ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম—কেন ?

কেন আবার কি ? ভৃত প্রেত কি নেই যে, এই শনিবারের অমাবস্যায় তুমি যাবে শ্যশানে ? প্রাণ নিয়ে কি তা হ'লে আর ফিরে অ'সতে হবে ! বলিয়াই পিয়ারী অকস্মাৎ বার বার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করিব, কি জবাব দিব, ভাবিয়াই পাঠিলাম না। ভাবিয়া না পাওয়ার আর আশ্চর্য্য কি ? যাহাকে চিনি না, জানি না, সে যদি উৎকট হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর রাত্রে ডাকাইয়া আনিয়া স্নমুখে দাঁড়াইয়া থামোকা কান্না জুড়িয়া দেয়—হতবুদ্ধি হয় না কে ? আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, তুমি কি কোন দিন শাস্ত-স্ববোধ হবে না ? তেমনি একগুঁয়ে হয়ে চিরকালটা কাটাবে ?

আমি কহিলাম, কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন ?

পিয়ারী কহিল, দেবই বা কেন ? সত্যিকারের ভৃত কি নেই যে, তুমি যাবে বললেই যেতে দেব ? আমি চোঁচিয়ে হাট বাধাব—তা বলে দিচ্ছি। এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, সত্যিকারের ভৃত

আছে কি না জানি না, কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে জানি। তারা স্তম্ভে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কাঁদে, পথ আগ্‌লায়—এমন অনেক কীর্তি করে, আবার দরকার হ'লে ঘাড় মটকেও খায়। পিয়ারী মলিন হইয়া গেল! বলিল, আমাকে তা হ'লে তুমি চিনেচ বল! কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক কীর্তি করে সত্যি, কিন্তু ঘাড় মটকাবার জ্ঞেই পথ আগ্‌লায় না। তাদেরও আপনার-পর বোধ আছে। আমি পুনরায় সহাস্তে প্রশ্ন করিলাম, এ তোমার নিজের কথা, কিন্তু তুমি কি ভূত?

পিয়ারী কহিল, ভূত বই কি। যারা মরে গিয়েও মরেনা, তারাই ভূত; এক হিসাবে আমি যে মরেছি, তা সত্যি। কিন্তু নিজের মরণ আমি—নিজে রটাইনি। মামাকে দিয়ে মা রটিয়েছিলেন। শুনবে সব কথা? তাহার মরণের কথা শুনিয়া, এতক্ষণে আমার সংশয় কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে পারিলাম—এই সেই রাজলক্ষ্মী। অনেক দিন পূর্বে মায়ের সহিত সে তীর্থযাত্রা করিয়াছিল—আর ফিরে নাই। কাশীতে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা গ্রামে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাকে কখনো যে আমি ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলাম—এ কথা মনে করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার একটা অভ্যাস আমি এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিতেছিল। কখন, কোথায়, কাহাকে যেন ঠিক এমনি ধরা করিতে অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া কেবলি মনে হইতেছিল; কিন্তু কে সে, কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি, কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে

দেখিয়া আমি ক্ষণকালের জন্ম বিষয়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সর্দার-পোড়ো, সেই সময়ে ইহার দুইপুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়াইয়া দেয়। স্বামী-পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট-নয় বৎসর; সুরলক্ষ্মীর বারো-তেরো। ইহার রঙটা বরাবরই ফর্সা; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত, হাত-পা কাঠির মত, মাথার চুলগুলি তামার শলার মত—কতগুলি তাহা গুণিয়া বলা যাইতে পারিত। আমার মারের ভয়ে এই মেয়েটা বঁইচির বনে ঢুকিয়া প্রত্যহ একছড়া পাকা বঁইচি ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমাকে দিত; সেটা কোন দিন ছোট হইলেই, পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইংকে প্রাণ ভরিয়া চপেটাঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাকা ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে যাই হোক, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়েই সে এত ক্লেশ স্বীকার করিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ একটুখানি সংশয় হইল। তা সে যাক্। তার পরে ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার! ভাগ্যীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ জানা গেল, বিরিকি দস্তের পাচক ব্রাহ্মণ ভগ্ন-কুলীনের সন্তান। এই কুলীন-সন্তানকে দস্তমশাই বাঁকুড়া হইতে বদলী হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিরিকি দস্তের দুয়ারে মামা ধন্য দিয়া পড়িলেন—ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা

করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর হাবা-গোবা ভালোমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সংসার বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একাম্মো টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত সস্তায় হবে না মশাই—বাজার যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ-এক টাকায় একজোড়া ভাল রামছাগল পাওয়া যায় না—তা জামাই খুঁজছেন। একশ-একটি টাকা দিন—একবার এ-পিঁড়িতে ব'সে, আর একবার ও-পিঁড়িতে ব'সে, দুটো ফুল ফেলে দিচ্ছি। দুটি ভগ্নাই একসঙ্গে পার হবে। আর একশখানি টাকা—দুটো ঘাঁড় কেনার খরচটাও দেবেন না? কথাটা অসঙ্গত নয়, তথাপি অনেক কষা-মাজা ও সহি-সুপারিশের পর সত্তর টাকায় রফা হইয়া একরাত্রে একসঙ্গে সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। দুইদিন পরে সত্তর টাকা নগদ লইয়া দু-পুরুষে কুলীন জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাহাকে দেখে নাই। বছর-দেড়েক পরে স্নীহা-জুরে সুরলক্ষ্মী মরিল এবং আরও বছর-দেড়েক পরে এই রাজলক্ষ্মী কাশীতে মরিয়া শিবহ লাভ করিল। এই ত পিয়ারী বাইজীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাইজী কহিল, তুমি কি ভাবছ, বলব?

কি ভাব্‌চি?

তুমি ভাবচ, আহা! ছেলে-বেলায় একে কত কষ্টই দিয়েচি! কাঁটার বনে পাঠিয়ে রোজ-রোজ বঁইচি তুলিয়েচি, আর তার বদলে শুধু মার-ধোর করেছি। মার খেয়ে চুপ-ক'রে কেবল কেঁদেছে, কিন্তু কখনো কিছু চায় নি। আজ যদি

একটা কথা বল্চে ত শুনিই না। না হয় নাই গেলাম শ্মশানে।
এই না? কিন্তু ছিঃ! আমাকে তুমি একেবারেই ভুলে
গিয়েছিলে—দখে চিন্তেও পারোনি! বলিয়া হাসিয়া মাথা
নাড়িতেই তাহার দুই কানের হীরাগুলি পর্য্যন্ত ঢুলিয়া হাসিয়া
উঠিল।

আমি বলিলাম, তোমাকে মনেই বা কবে করেছিলাম যে, ভুলে
যাবো না? বরং আজ চিন্তে পেরেচি দখে নিজেই আশ্চর্য
হয়ে গেছি। আচ্ছা, বারোটা বাজে—চল্লুম।

একটুখানি স্থির থাকিয়া পিয়ারা কহিল, আচ্ছা, ভৃত-প্রত না
মানো, সাপ-খোপ, বাঘ-ভালুক, বুনোশূয়ার এগুলোকে ত বনে-
জঙ্গলে অঙ্গকার রাত্রে মানা চাই।

আমি বলিলাম, এগুলোকে আমি মেনে থাকি, এবং যথেষ্ট
সতর্ক হয়েও চলি।

আমাকে যাইতে উত্তর দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যে-
স্বাতের মানুষ, তাতে তোমাকে যে আটকাতে পারব না, সে ভয়
আমার খুবই ছিল; তবু ভেবেছিলাম, কান্নাকাটি ক'রে হাতে পায়ে
ধরলে শেষ পর্য্যন্ত হয় ত নাও যেতে পারো। কিন্তু আমার
কান্নাই সার হ'ল! আমি জবাব দিলাম না দেখিয়া পুনরায়
কহিল, আচ্ছা, যাও—পেছু ডেকে আর অমঙ্গল করব না। কিন্তু
একটা কিছু হ'লে, এই বিদেশ বিড়ংয়ে রাজা-রাজ্জড়া বন্ধু-বান্ধব
কোন কাজেই লাগবেনা, তখন আমাকেই ভুগতে হবে। আমাকে
চিন্তে পারো না, আমার মুখের পরে ব'লে তুমি পৌরষী ক'রে
গেলে, কিন্তু বিপদের সময় আমি ত আর বলতে পারবনা—এঁকে

চিনিতে । একশবার ‘বাইজী’ ব’লে যত অপমানই কর না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না—এ কি আর তুমি মনে মনে বোঝো না ? কিন্তু ফেলে যেতে পারলেই ভাল হ’তো । তোমাদের একটা শিক্ষা হ’তো ।

আমি দ্রুতপদে শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম ।

বাপ !

চমকিয়া উঠিলাম । সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর ; এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোন্ সূদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে । সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঝোপ । অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভরস্কর অমানিশায় প্রেতাঙ্গার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে যাহার আসন গ্রহণ করিয়া, নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে ! মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ সংখ্যাতীত গ্রহতারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে । হাওয়া নাই, শব্দ নাই ; নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায় কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্য্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই । যে রাত্রিচর পাখীটা একবার বাপ্ বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না । পশ্চিম-মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম—এই দিকেই সেই মহাশ্মশান । একদিন শীকারে আসিয়া সেই যে শিমূলগাছগুলো দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছুদূর আসিতেই তাহাদের কালো কালো ডাল-পালা চোখে পড়িল । ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল । ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে । এইবার

অতি অক্ষুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরো একটু অগ্রসর হইতে, তাহা পরিস্ফুট হইল। এক একটা মা ‘কুন্তকর্ণের ঘুম’ ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষকালে নিঃশব্দ হইয়া যে প্রকারে রহিয়া রহিয়া কাঁদে, ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না, এবং পূর্বের শুনে নাই—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়, শকুন-শিশু—অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে—না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই, এ কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো কালো ঝড়ির মত শিশুদের ডালে ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে; এবং তাহাদেরই কোন একটা দুমট ছেলে অমন করিয়া আন্তর্কণ্ঠে কাঁদিতেছে।

গাছের উপরে সে কাঁদিতেই লাগিল; আমি নীচে দিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ মহাশ্মশানের একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালে তিনি যে বলিয়াছিলেন, লক্ষ নরমুণ্ড গণিয়া লওয়া যায়—দেখিলাম, কণাটা নিতান্ত অতুলিত নয়। সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরকঙ্কালে খচিত হইয়া আছে। গেণ্ডুয়া খেলিবার নরকপাল অসংখ্য পড়িয়া আছে; তবে খেলোয়াড়েরা তখন আসিয়া জুটিতে পারে নাই। আমি ছাড়া আর কোন অশরীরী দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন কি না, এই দুটা নশ্বর চক্ষে আবিষ্কার করিতে

পাৰিলাম না। তখন ঘোৰ অমাবস্তা। স্তূত্ৰাং খেলা স্তূৰু
হইবার আৰ বেষী দেৱি নাই আশা কৰিয়া, একটা বালুৰ টিপির
উপৰ গিয়া চাপিয়া বসিলাম। বন্দুকটা খুলিয়া, টোটাটা আৰ
একবার পৰীক্ষা কৰিয়া। পুনৰায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট কৰিয়া,
কোলের উপৰ রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া ৰহিলাম। হায় রে টোটা!
বিপদের সময় কিন্তু সে কোনেই সাহায্য কৰিল না।

পিয়াৰীৰ কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল, যদি অকপটে
বিশ্বাসই কৰ না তবে কৰ্ম্মভোগ কৰিতে যাওয়া কেন? সত্যই
ত! এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচৰ ত পাপ নাই।
আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি—
আমার সাহস কত। সকালে যাহাৰা বলিয়াছিল, ভীৰু বাঙ্গালী
কাৰ্য্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদের কাছে শুধু এই কথাটা সপ্ৰমাণ
কৰা যে, বাঙ্গালী বড় বীৰ।

হঠাৎ একটা দম্কা বাতাস কতকগুলো ধূলা-বালি উড়াইয়া
গায়ের উপৰ দিয়া বহিয়া গেল; এবং সেটা শেষ না হইতেই,
আৰ একটা এবং আৰ একটা বহিয়া গেল। এই দম্কা বাতাসটা
শুধু ধূলা বালিই উড়াইল না, আমার মজ্জাগত গোপন-সংস্কাৰে
গিয়াও ঘা দিল। ক্ৰমশঃ ধীৰে ধীৰে বেশ একটু জোৰে হাওয়া
উঠিল। অনেকেই হয় ত জানেন না যে মড়ার মাথার ভিতৰ
দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীৰ্ঘশ্বাস ফেলা গোছের শব্দ হয়।
দেখিতে দেখিতে আশে-পাশে, স্তূমুখে, পিছনে দীৰ্ঘশ্বাসের যেন
ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক
যেন আমাকে ঘিৰিয়া বসিয়া, অবিশ্রাম হা-হতাশ কৰিয়া নিশ্বাস

ফেলিতেছে ; এবং ইংরাজীতে যাহাক বলে ‘uncanny feeling’ ঠিক সেই ধরনের একটা অস্বস্তি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটা-দুই ঝাঁকানি দিয়া গেল । সেই শকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে পিছনে আরও বেশি করিয়া গোঙাইতে লাগিল । বুঝিলাম, ভয় পাইয়াছি ।

এতকাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু এ কথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই আমার চৈতন্য হারাইলে চলিবে না । তাহা হইলে মরণ অনিবার্য্য । দেখি, ডান পা-টা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে । থামাইতে গেলাম, থামিল না । সে যেন আমার পা নয় ।

ঠিক এমনি সময়ে অনেক দূরে অনেকগুলি গলার সমবেত চীৎকার কানে পৌঁছিল—বাবুজী ! বাবুসাব ! সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল । কাহার ডাকে ? আবার চীৎকার করিল—গুলি ছুঁড়বেন না যেন ! শব্দ ত্র্যমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—গোটা-দুই কাঁপ আলোর রেখাও আড়চোখে চাহিতে চোখে পড়িল । একবার মনে হইল, চীৎকারের মধ্যে যেন রতনের গলার আভাস পাইলাম । খানিক পরেই টের পাইলাম, সেই বটে । আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, সে একটা শিমুলের আড়ালে দাঁড়াইয়া, চোঁচাইয়া বলিল, বাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, গুলি-টুলি ছুঁড়বেন না—আমরা রতন । রতন লোকটা যে সত্যিই নাপিত, তাহাতে আর ভুল নাই । উল্লাসে চোঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না ।

রতন এবং আরও তিনজন লোক গোটা-দুই লণ্ঠন ও লাঠিসোটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল । এই

তিনজনের মধ্যে একজন ছটুলাল—সে তব্লা বাজায় ; এবং আর একজন পিয়ারীর দরওয়ান। তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকিদার।

রতন কহিল, চলুন—তিনটে বাজে।

চল, বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে রতন বলিতে লাগিল, বাবু, ধন্য আপনার সাহস। আমরা চারজনে যে কত ভয়ে ভয়ে এসেছি, তা বলতে পারিনে।

এলি কেন ?

রতন কহিল, টাকার লোভে। আমরা সবাই এক মাসের মাইনে নগদ পেয়ে গেছি। বলিয়া আমার পাশে আসিয়া, গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু, আপনি চলে এলে গিয়ে দেখি, মা বসে বসে কাঁদছেন। আমাকে বল্লেন, রতন, কি হবে বাবা ; তোরা পিছনে যা। আমি এক-একমাসের মাইনে তাদের বকসিস্ দিচ্ছি। আমি বল্লুম, ছটুলাল আর গণেশকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারি মা ; কিন্তু পথ চিনি। এমন সময় চৌকিদার হাঁক দিতেই মা বল্লেন, ওকে ডেকে আন রতন, ও নিশ্চয়ই পথ চেনে। বেরিয়ে গিয়ে ডেকে আনলুম। চৌকিদার ছ টাকা হাতে পেয়ে, তবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা বাবু, কচিছেলের কান্না শুনতে পেয়েছেন ? বলিয়া রতন শিহরিয়া উঠিয়া, আমার কোটের পিছনটা চাপিয়া ধরিল। কহিল, আমাদের গণেশ পাঁড়ে বামুনমানুষ, তাই আজ রক্ষে পাওয়া গেছে, নইলে—

আমি কথা কহিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া কাহারো ভুল ভাঙ্গিবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আচ্ছন্ন, অভিভূতের মত নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর আসার পর রতন প্রশ্ন করিল, আজ কিছু দেখতে পেলেন বাবু ?

আমি বলিলাম, না।

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে রতন ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমরা যাওয়ায় আপনি কি রাগ করেছেন বাবু ?

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, না রতন, আমি একটুও রাগ করিনি।

তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া চৌকিদার তাহার কাজে চলিয়া গেল। গণেশ ছটুলাল চাকরদের তাঁবুতে প্রস্থান করিল। রতন কহিল, মা বলেছিলেন, যাবার সময় একটিবার দেখা দিয়ে যেতে।

ধমকিয়া দাঁড়াইলাম। রতন বিস্মিত হইয়া কহিল, ওখানে অন্ধকারে দাঁড়ালেন কেন বাবু—আত্মন ?

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, না, রতন, এখন নয়, তাঁকে আমার অসংখ্য নমস্কার দিয়ে বোলো, কাল যাবার আগে দেখা হবে।—আমার বড় ব্যয় পেয়েছে রতন, আমি চল্লুম। বলিয়া বিস্মিত, ক্ষুব্ধ রতনকে জবাব দিবার সময়মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে ওদিকের তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলাম।

নয়

বাবুসাব! রাজভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শয্যার উপর সোজা উঠিয়া বসিলাম। সে সসম্মানে নিবেদন করিল, কুমারসাহেব এবং বহুলোক আমার গত-রাত্রির কাহিনী শুনিবার জন্য উদগ্রীব

হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। প্রশ্ন করিলাম, তাঁরা জানিলেন কিরূপে? বেহারা কহিল, তাঁবুর দরোয়ান জানাইয়াছে যে, আমি রাত্রিশেষে ফিরিয়া আসিয়াছি।

হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, বড়-তাঁবুতে প্রবেশ করিবা-মাত্রই সকলে হৈ হৈ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। একসঙ্গে এক লক্ষ প্রশ্ন হইয়া গেল। দেখিলাম, কালকের সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিও আছেন, এবং একপাশে পিয়ারী তাহার দলবল লইয়া নীরবে বসিয়া আছে। প্রতিদিনের মত আজ আর তাহার সহিত চোখাচোখি হইল না। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল।

উচ্ছ্বসিত প্রশ্নতরঙ্গ শান্ত হইয়া আসিলে জবাব দিতে শুরু করিলাম। কুমারজী কহিলেন, ধন্য সাহস তোমার শ্রীকান্ত! কত রাত্রে সেখানে পৌঁছুলে?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

প্রবীণ ব্যক্তিটি কহিলেন, ঘোর অমাবস্তা। সাড়ে এগারটার পর অমাবস্তা পড়িয়াছিল।

চারিপাশ হইতেই বিস্ময়সূচক ধ্বনি উথিত হইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে, কুমারজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তার পর? কি দেখলে?

আমি বলিলাম, বিস্তর হাড়গোড় আর মড়ার মাথা।

কুমারজী বলিলেন, উঃ, কি ভয়ঙ্কর সাহস! শ্মশানের ভেতর ঢুকলে, না বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে?

আমি বলিলাম, ভেতরে ঢুকে একটা বালির টিপিতে গিয়ে বসলাম।

তার পর, তার পর ? বসে কি দেখলে ?

ধূ ধূ করছে বালির চর ।

আর ?

কসাড় ঝোপ, আর শিমুলগাছ ।

আর ?

নদীর জল ।

কুমারজী অধীর হইয়া কহিলেন, এ সব ত জানি হে ! বলি, সে সব কিছ—

আমি হাসিয়া ফেলিলাম । বলিলাম, আর গোটা-দুই বাড়ুড় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছিলুম ।

প্রবীণ ব্যক্তিটি তখন নিজে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আউর কুছ্ নেহি দেখা ?

আমি কহিলাম, না । উত্তর শুনিয়া এক তাঁবু লোক সকলেই যেন নিরাশ হইয়া পড়িল । প্রবীণ লোকটি তখন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ্যাসা কভি হো নহি সকতা, আপ গয়া নহি । তাঁহার রাগ দেখিয়া আমি হাসিলাম । কারণ, রাগ হইবারই কথা, কুমারজী আমার হাতটা চাপিরা ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিলেন, তোমার দিকি শ্রীকান্ত, কি দেখলে সত্যি বল ।

সত্যিই বল্চি, কিছু দেখিনি ।

কতকক্ষণ ছিলে সেখানে ?

ঘণ্টা-তিনেক ।

আচ্ছা, না দেখেচ, কিছু শুনতেও পাও নি ?

তা পেয়েছি ।

এক মুহূর্তেই সকলের মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।
 কি শুনিয়াছি, শুনিলার জন্য তাহারা আরও একটু ঘোঁষিয়া
 আসিল। আমি তখন বলিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া পথের
 উপরেই একটা রাত্রিচর পাখী বাপ্ বলিয়া উড়িয়া গেল; কেমন
 করিয়া শিশুকণ্ঠে শকুনশিশু শিমূলগাছের উপর গোঁয়াইয়া গোঁয়াইয়া
 কাঁদিতে লাগিল; কেমন করিয়া হঠাৎ ঝড় উঠিল এবং মড়ার
 মাথাগুলা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং সকলের শেষে কে যেন
 আমার পিচনে দাঁড়াইয়া অবিশ্রাম তুষারশীতল নিশ্বাস আমার ডান
 কানের উপর ফেলিতে লাগিল। আমার বলা শেষ হইয়া গেল,
 কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারো মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল
 না। সমস্ত তাঁবুটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে সেই প্রবীণ
 বান্ধিটী একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার কাঁধের উপর
 একটা হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, বাবুজী, আপনি যথার্থ
 ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়াই কাল প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু
 আর কেহ হইলে পারিত না। কিন্তু আজ হইতে এই বুড়ার
 শপথ রহিল বাবুজী, আর কখনো এরূপ দুঃসাহস করিবেন না।
 আপনার পিতামাতার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম—এ শুধু
 তাঁহাদেরই পুণ্যে আপনি বাঁচিয়াছেন। বলিয়া সে কোঁকের
 মাথায় থপ্ করিয়া আমার পায়েতেই হাত দিয়া ফেলিল।

আগে বলিয়াছি এই লোকটি কথা কহিতে জানে। এইবার
 সে কথা স্তব্ধ করিল। চোখের তারা, ভুরু, কখনো সঙ্কুচিত,
 কখনো প্রসারিত, কখনো নির্বাপিত, কখনো প্রজ্জ্বলিত করিয়া, সে
 শকুনির কান্না হইতে আরম্ভ করিয়া কানের উপর নিশ্বাস ফেলার

এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিল যে, দিনের-বেলা এতগুলো লোকের মধ্যে বসিয়াও আমার পর্য্যন্ত মাথার চুল কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। কাল সকালের মত আজও কখন যে পিয়ারী নিঃশব্দে আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। গল্প শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কুমারজীকে একটা সেলাম করিয়া অনুরোধ লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আজ সকালেই আমার বিদায় লইবার কথা ছিল। কিন্তু শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া, কুমারজীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া ও-বেলায় যাওয়া স্থির করিয়া নিজেদের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম।

আজ ছপুর-বেলাটা আমার ঘুমাইয়া পড়িবারই কথা; বিছানায় পড়িয়া মাঝে মাঝে তন্দ্রাও আসিতে লাগিল। এমনি করিয়া বেলা গড়াইয়া গেল। বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম সূর্য্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। খানিকটা দূর অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর বক্ বক্ করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিষ্মৃত জমিদারের মস্ত কান্তি! দীঘিটা প্রায় আধ ফ্রোশ দাঁর্ব। উত্তরদিকটা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না। কথায় কথায় শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটা যে কতদিনের এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরাণো ভাঙা ঘাট ছিল; তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এক সময়ে ইহারই চতুর্দিক ঘিরিয়া বর্দ্ধিত গ্রাম ছিল; কবে নাকি

ওলাউঠায় মহামারিতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান। অন্তগামী সূর্যের ত্র্যাক্ষরী রশ্মিগণ ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তারপরে ক্রমশঃ সূর্য্য ডুবিয়া দীঘির কালো জল আরো কালো হইয়া উঠিল, অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত্ত শৃগাল ভয়ে ভয়ে জলপান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে, সে সময়টুকু কাটাইতে আসিয়াছিলাম তাহা কাটিয়া গিয়াছে—সমস্ত অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না—এই ভাঙ্গা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যে পা রাখিয়া বসিয়াছি, সেইখানে পা দিয়া কতলোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহারা স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথাকার কোন্ জলাশয়ে এই সমস্ত নিত্যকর্ম সমাধা করে? এই গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এমনি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তারপরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারীরূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তখন কত মুমূর্ষু হয় ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া এই ঘাটের উপরেই শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছে। হয় ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না তাহাই যে নাই, এমন কথাই বা কে জোর

করিয়া বলিবে ? আজ সকালেই সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি বলিয়া-
ছিলেন, বাবুজী মৃত্যুর পরে সে কিছুই থাকে না, অসহায়
প্রেতাত্মারা যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা লইয়া বিচরণ
করে না, তাহা কদাচ মনে করিয়ো না । এই বলিয়া তিনি রাজা
বিক্রমাদিত্যের গল্প, তাল-বেতাল সিদ্ধির গল্প, আরও কত তান্ত্রিক
সাধু-সন্ন্যাসীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন । আরও বলিয়া-
ছিলেন যে, সময় এবং সুযোগ হইলে তাহারা যে দেখা দিতে,
কথা কহিতে পারে না বা, করে না, তাহাও ভাবিয়ো না ;
তোমাকে আর কখনো সেন্সানে যাইতে বলি না ; কিন্তু যাহারা
এ কাজ পারে, তাহাদের সমস্ত দুঃখ যে কোনদিন সার্থক হয় না,
এ কথা স্মরণেও অবিশ্বাস করিয়ো না !

তখন সকাল-বেলায় আলোর মধ্যে যে কথাগুলো শুধু নিরর্থক
হাসির উপাদান আনিয়া দিয়াছিল, এখন সেই কথাগুলোই এই
নির্ভরজন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আর একপ্রকার চেহারা লইয়া
দেখা দিল । মনে হইতে লাগিল, জগতে প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু
থাকে ত সে মরণ । এই জীবনব্যাপী ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের
অবস্থাপ্রলো যেন আতসবাজীর বিচিত্র সাজ-সরঞ্জামের মত শুধু
একটা কোন বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্তই এত যত্নে এত
কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে । তবে মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি
কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তার চেয়ে লাভ আর
আছে কি ? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না !

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙিয়া গেল । ফিরিয়া
দেখিলাম শুধু অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই । একটা গা ঝাড়

দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া নিজের মনে হাসিয়া বলিলাম, না, আর বসে থাকা নয়। কাল ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলে গেছে, আজ এসে যদি বাঁ কানের উপর সুরু করে দেয় ত বড় সোজা হবে না।

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি? চলিয়াছি ত চলিয়াছি—এই সন্ধীর্ণ পায়ে-চলা পথ যে আর শেষ হয় না। এতগুলো তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ হইতে সম্মুখে একটা বাঁশঝাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, কৈ এটা ত আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই! দিক্ ভুল কারিয়া ত আর একদিকে চলি নাই? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম সেটা বাঁশঝাড় নয়, গোটা-কয়েক তেঁতুলগাছ জড়াজড়ি করিয়া দিগন্ত আবৃত করিয়া অন্ধকার জমাট বাঁধাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহারই নীচে দিয়া পথটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। যায়গাটা এম্নি অন্ধকার যে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বৃকের ভিতরটা কেমন যেন গুরু গুরু করিয়া উঠিল—এ যাইতেছি কোথায়? চোখ কান বুজিয়া কোনমতে সেই তেঁতুলতলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায়, ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সম্মুখে ওই উঁচু যায়গাটা কি? নদীর ধারের সরকারী বাঁধ নয় ত? বাঁধই ত বটে। পা দুটা যেন ভাজিয়া আসিতে লাগিল; তবুও টানিয়া টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম,

ঠিক তাই। ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান! আবার কাহার পদশব্দ স্রুমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়া টলিয়া সেই ধূলা-বালুর উপরেই মূর্চ্ছিতের মত ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানে পথ দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙা ঘাটের উপর গা বাড়ি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

দশ

কেমন করিয়াই যে এই অন্ধকার নির্মাণে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙাঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সেই পদধ্বনি এই মাত্র স্রুমুখে মিলাইয়া গেল, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই— কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনি স্বাকার করাও এ স্বাকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য্য নয়। কারণ নিজের চোখেই ত দেখিয়াছি— আমাদের গ্রামেই একটা বন্ধ পাগল ছিল; সে দিনের-বেলা বাড়ী বাড়ী ভাত চাহিয়া খাইত, আর রাত্রিতে একটা ছোট মইয়ের উপর কৌচার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া, সেটা স্রুমুখে উচু করিয়া ধরিয়া পথের ধারের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। সে চেহারা দেখিয়া অন্ধকারে কত লোকের যে দাঁতকপাটি লাগিয়াছে, তার অবধি নাই। কোন স্বার্থ নাই,

অথচ এই ছিল তাহার অন্ধকার রাত্রির কাণ্ড । নিরর্থক মানুষকে ভয় দেখাইবার আরও কত প্রকারের অদ্ভুত ফন্দি যে তাহার ছিল, তাহার সীমা নাই । শুকনো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন দিত ; মুখে কালিঝুলি মাখিয়া বিশালাকী দেবার মন্দিরে বহুক্লেশে খড়া বহিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিত ; গভীর রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া খোনা গলায় চাষাদের নাম ধরিয়া ডাকিত । অথচ কেহ কোন দিন তাহাকে ধরিতে পারে নাই ; আর এ শুধু আমাদের গ্রামেই নয়—আট-দশখানা গ্রামের মধ্যেই সে এই কৰ্ম্ম করিয়া বেড়াইত । মরিবার সময় নিজের বজ্জাতি সে নিজে স্বীকার করিয়া যায় ; এবং ভূতের দোরাহ্মাও তখন হইতে শেষ হয় । এ ক্ষেত্রেও হয়তো তেমন কিছু ছিল, হয় ত ছিল না ।

সেই ধূলা-বালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দুটি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল । মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—ছি ছি ; ও তুই কি করিলি ? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জ্ঞান ! আয় আয় ! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয় । এমন অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বসিস্ না—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্ । কথাগুলো কানে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না ।

তথাপি এ কথাটা ভুলি নাই যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে—আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে ; এবং সে জ্ঞান একবার অন্ততঃ

চেষ্টা করিতাম, কিন্তু মনে হইল সব বৃথা। এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার কল্পনাও করি নাই।

সুতরাং চঞ্চল হইয়া ছটফট করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোন প্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া যখন স্থির হইয়া বসিলাম, তখন অকস্মাৎ যে জিনিসটি চোখে পড়িয়া গেল, তাহার কথা আমি কোন দিন বিস্মৃত হই না।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি দ্বারা দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশ-তলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিম্নলিখিত-চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব চরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে শ্রদ্ধা হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষের কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পবিবাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসি-কৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের

প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার ! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে ? যাকাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার ! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন ! তাই রাধার দুইচক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বচায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম ! কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই ; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিকুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল ; এবং অতীত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই । তবে হয় ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয় ; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয় ত তার এমনি অফুরন্ত, সুন্দর রূপে আমার দুইচক্ষু জুড়াইয়া যাইবে । আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে হে আমার কালো ! হে আমার অভাগ্র, পদধ্বনি ! হে আমার সর্ব-দুঃখ-ভয়-বাধাহারী অনন্ত সুন্দর ! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্বাত্ম ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জ্ঞান মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি । সহসা মনে হইল, তাই ত ! তাহার ওই নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জ্ঞান ? একেবারে ভিতরে, মাঝখানে গিয়া বসি না কেন !

নাহিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়াছিলাম, তখন হুঁস ছিল না। হুঁস হইলে দেখিলাম, ত্রমণ অঙ্ককার আর নাই— আকাশের এক প্রান্ত যেন স্বেচ্ছ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া তুলিতেছে। একটা চাপা কথাবার্তার কোলাহল কানে গেল। তাহার করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমুল গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারো যেন চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহার দুই-চারিটা লগনের আলোকও আশে পাশে উজ্জ্বল হইতেছে। পুনরবার বাঁধের উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দুইখানা গরুর গাড়ীর অগ্রপশ্চাৎ জন-কয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম, কাহারো এই পথে স্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় স্মৃতি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যিক। কারণ আগন্তকের দল যত বৃদ্ধিমান এবং সাহসী হোক, ইত্যং এই অঙ্ককার রাত্রিতে একপস্থানে আমাকে একাকা ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর কিছু না করুক একটা বিষম হৈ হৈ রৈ রৈ চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্বস্থানে দাঁড়াইলাম, এমনি সময়ে সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে স্ব-উচ্চ কণ্ঠের ডাক কানে গেল, শ্রীকান্তবাবু—

সাদা দিলাম, কে রে রতন ?

আজ্ঞে, হাঁ বাবু, আমি। একটু এগিয়ে আসুন।

দ্রুতপদে বাঁধের উপরে উঠিয়া ডাকিলাম, রতন, তোরা কি বাড়ী যাচ্ছিস্ ?

রতন উত্তর দিল, ঠা বাবু, বাড়ী যাচ্ছি—মা গাড়ীতে আছেন।

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পদ্মার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দরোয়ানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি। 'গাড়ীতে উঠে এসো কথা আছে।

আমি সন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কথা ?

উঠে এসো বল্চি।

না, তা পারবনা, সময় নেই। ভোরের আগেই আমাকে তাঁবুতে পৌঁছুতে হবে।

পিয়ারী বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, একবার উঠে এসো—

কতকটা যেন হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। পিয়ারী গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিয়া কহিল, আজ আবার এখানে তুমি কেন এলে ?

আমি সত্য কথাই বলিলাম। কহিলাম, জানি না।

পিয়ারী বলিল, আচ্ছা বেশ। কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন ? আমি লুকিয়েও আসিনি, আসবার ইচ্ছেও ছিল না।

পিয়ারী বিজ্রপের স্বরে কহিল, তা হ'লে তাঁবু থেকে তোমাকে উড়িয়ে এনেচে—বোধ করি বলতে চাও ?

না, তা বলতে চাইনে। উড়িয়ে কেউ আনেনি ; নিজের পায়ে হেঁটে এসেছি সত্যি। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।

পিয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, রাজলক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি না জানিনে, কিন্তু বাস্তবিক বাপারটা একটু আশ্চর্য্য। বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলাম।

পদ্মা তোলা ছিল। পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, অ'কাশ ফর্সা হইয়া গেছে। বলিলাম, এইবার আমি যাই।

পিয়ারী একটুখানি দ্বান হাসি হাসিয়া বলিল, যাবে ? আচ্ছা নাও ! কিন্তু কথা দাও—আজ বলা বাবোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে ?

আচ্ছা।

কারো কোন অনুরোধেই আজ রাত্রি ওখানে কাটাবে না, বল ?

না।

পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল, আমার দ্বার একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বাড়ী দিবে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।

আমি সন্মতিকর করিয়া প্রস্তান করিলাম।

আড্ডায় পৌঁছাইতে প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। দ্রুতপদে তাঁবুর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বড় ভোরেই বেড়াতে বার হ'য়েছিলেন।

আমি হাঁ-না কোন কথাই না বলিয়া শয্যায় চোখবুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

এগার

বাটা ফিরিয়া তাহাকে চিঠি দিলাম। অবিলম্বে জবাব আসিল। আমি একটা বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়াছিলাম—কোন দিন পিয়ারী আমাকে তাহার পাটনার বাটাতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি ত করেই নাই, সামান্য একটা মুখের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত জানায় নাই। এই পত্রের মধ্যেও তাহার লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। শুধু নীচের দিকে একটা ‘নিবেদন’ ছিল, বাহা আমি আজও ভুলি নাই। সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে তাহাকে বিস্মৃত না হই—এই প্রার্থনা।

দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়িতে লাগিল—এবার শিকার হইতে ফিরিয়া পর্যন্ত আমার মন যেন কেমন বিনয়ী হইয়া গেছে ; কখন যেন একটা অভাবের বেদনা চাপা সন্দির মত দেহের রক্তে রক্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে।

এটা মনে পড়ে, সে দিনটা হোলীর রাত্রি। মাথা হইতে তখনও আবিরের গুঁড়া সাবান দিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলা হয় নাই। ক্লান্ত বিবশ দেহে শয়্যার উপর পড়িয়াছিলাম। পাশের জানালাটা খোলা ছিল, তাই দিয়া সুমুখের অশ্রু গাছের ফাঁক দিয়া আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়াছিলাম। এতটাই মনে পড়ে। কিন্তু কেন যে দোর খুলিয়া সোজা স্টেশনে চলিয়া গেলাম এবং পাটনার টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম—তাহা মনে পড়ে না। রাত্রিটা গেল। কিন্তু দিনের-বলা যখন

শুনিলাম সেটা 'বাড়' স্টেশন এবং পাটনার আর দেরি নাই—তখন হঠাৎ সেইখানেই নামিয়া পড়িলাম। পকেটে হাত দিয়া দেখি উদ্বেগের কিছুমাত্র হেতু নাই, দুআনি এবং পয়সাতে দশটা পয়সা তখনও আছে। খুসি হইয়া দোকানের সন্ধানে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দোকান মিলিল। চুড়া, দতি এবং শর্করা সংযোগে অভূতকৃত ভোজন সম্পন্ন করিতে অন্ধেক বায় হইয়া গেল। তা যাক্। জাবনে অমন কত য'য়—সে জগৎ ক্ষুণ্ণ হওয়া কাপুরুষতা।

গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টা-খানেক ঘুরিতে না-ঘুরিতে টের পাইলাম যায়গাটার দক্ষিণে ও চুড়া যে পরিমাণে উপাদেয়, পানায় জলটা সেই পরিমাণে নিকট। আমার অমন ভূরিভোজন এইটুকু সময়ের মধ্যে এমনি পরিপাক করিয়া নষ্ট করিয়া দিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন দশ-বিশ দিন তণ্ডুল-কণাটিও মুখে যায় নাই। একরূপ কদর্যা স্থানে বাস করা আর একদণ্ড উচিত নয় মনে করিয়া স্থান-গাগের কল্পনা করিতেছি, দেখি অদূরে একটা আমবাগানের ভিতর হইতে ধূম দেখা দিয়াছে।

আমার হ্যায়-শাস্ত্র জানা ছিল। ধূম দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম; বরঞ্চ অগ্নিরও হেতু অনুমান করিতে আমার বিলম্ব হইল না। স্মৃতরাং সোজা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, জলটা এখানকার বড় বদ।

বাঃ—এই ত চাই! এ যে খাঁটি সন্ন্যাসীর আশ্রম। মন্ত ধূনির উপর লোটায় করিয়া চায়ের জল চড়িয়াছে। 'বাবা'

অর্ধমুদ্রিত চক্ষে সম্মুখে বসিয়া আছেন; তাঁহার আশে পাশে গাঁজার উপকরণ। একজন বাচ্চাসন্ন্যাসী একটা ছাগী দোহন করিতেছে— চা-সেবায় লাগিবে। গোটা-দুই উট, গোটা-দুই টাটু ঘোড়া এবং সবৎসা গাভী কাছা-কাছি গাছের ডালে বাঁধা রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট তাঁবু। উকি মারিয়া দেখি, ভিতরে আমার বয়সী এক চেলা দুই পায়ে পাথরের বাটি ধরিয়া মস্ত একটা নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ তৈয়ারী করিতেছে। দেখিয়া আমি ভক্তিতে আপ্নত হইয়া গেলাম; এবং চক্ষের পলকে সাধু বাবাজীর পদতলে একেবারে লুটাইয়া পড়িলাম। পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া করজোড়ে মনে মনে বলিলাম, ভগবান, তোমার কি অসাম করুণা! কি স্থানেই আমাকে আনিয়া দিলে!

সাধুজী বলিলেন, কৈও বেটা?

আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, আমি গৃহত্যাগী মুক্তি-পথান্বেষী হতভাগ্য শিশু; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণ-সেবার অধিকার দাও।

সাধুজী মূহ হস্ত করিয়া বার দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দা করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, বেটা, ঘরে ফিরিয়া যাও—এ পথ অতি দুর্গম।

আমি করুণ-কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলাম, বাবা, আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তি পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।

সাধুজী খুসি হইয়া বলিলেন, বাত তেরা সাক্ষা হায়। আচ্ছা বেটা, রামজীক। খুসি। যিনি দুখ দোহন করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া চা তৈরি করিয়া ‘বাবা’কে দিলেন। তাঁহার সেবা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

ভাঙ্ তৈয়ারী হইতেছিল সন্ধ্যার জন্মে । তখনও বেলা ছিল, সুতরাং অণু প্রকার আনন্দের উদ্বোধন করিতে 'বাবা' তাঁর দ্বিতীয় চেলাকে গঞ্জিকার কলিকাটা ইজিতে দেখাইয়া দিলেন ; এবং প্রস্তুত হইতে বিলম্ব না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন ।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল । সর্বদর্শী 'বাবা' আমার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ বেটা, তোমার অনেক গুণ । তুমি আমার চেলা হইবার অতি উপযুক্ত পাত্র ।

আমি পরমানন্দে আর একবার 'বাবা'র পদদলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম ।

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম । দেখিলাম, গুরুজ্ঞার আশীর্বাদে অভাব কিছুই নাই । প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাটকা একসুট গেরুয়া বস্ত্র, জোড়া-দশেক ছোট-বড় রুম্মাকমালা এবং একজোড়া পিঠলের তাগা বাতির করিয়া দিলেন । যথানে যেটি মানায়—সাজ গোজ করিয়া, গানিকটা ধূনির চাই মাথায়, মুখে মাখিয়া ফেলিলাম । চাখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী, বলি আয়না-টায়না হয় ? মুখখানা যে ভারি একবার দেখেই ঠেকে হুচে ? দেখিলাম, তাহারও রস-বোধ আছে । তথাপি একটুখানি গম্ভীর হইয়া তাক্ছিল ভরেই বলিলেন, হয় একঠো ।

তবে লুকিয়ে আনো না একবার ।

মিনিট দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গলাম । দেখিলাম, যত্নে এবং সদা ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন । চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না । কে বলিবে—আমি সেই শ্রীকান্ত,

যিনি কিছুকাল পূর্বেই রাজা-রাজড়ার মজলিসে বসিয়া বাইজার গান শুনিতেছিলেন ! তা যাক্ ।

ঘণ্টা-খানেক পরে গুরুমহারাজের সমীপে দীক্ষার জন্ম নীত হইলাম । মহারাজ চেহারা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, বেটা, মইনা এক-আধ ঠহ্‌রো ।

মনে মনে বলত আচ্ছা বলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া যুক্তকরে, ভক্তিভরে একপাশে বসিলাম ।

আজ কথায় কথায় তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উপদেশ দিলেন ।

মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা একটু কঠোর রকমের ছিল । তাহার পরিমাণও যেমন, রসনাতেও তাহা তেমনি । চা, রুটি, ঘৃত, দধিভূক্ষ, চুড়া, শর্করা ইত্যাদি কঠোর সান্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান । আবার ভগবৎপদারবিন্দ হইতেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, সে দিকেও আমাদের লেশমাত্র অবহেলা ছিল না । ফলে আমার শুকনো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল,—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল ।

একটা কাজ ছিল—ভিক্ষায় বাহির হওয়া । মহারাজ নিজে ইহা করিতেন না, আমরা তাঁহার সেবকেরা পালা করিয়া করিতাম । সম্মাসীর অপরাপর কর্তব্যে আমি তাঁহার অন্য দুই চেলাকে অতি সহর ডিঙাইয়া গেলাম ; শুধু এইটাতেই বরাবর ধোঁড়াতেই লাগিলাম । এটা কোন দিনই নিজের কাছে সহজ এবং রুচিকর করিয়া তুলিতে পারিলাম না । এম্নি দিন যায় । দিন-পনের ত সেই আম-বাগানের মধ্যেই কাটিয়া গেল । দিনের-বেলা

কান বালাই নাই, শুধু রাত্রে মশার কামড়ের জ্বালায় মনে হইত—
থাক মোক্ষসাধন। গায়ের চামড়া আর একটু মোটা করিতে না
পারিলে ত আর বাঁচি না! সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সাত্বিক-
ভোজনের চেষ্টায় বহির্গত হইতেছি, গুরুমহারাজ ডাকিয়া
বলিলেন—

“ভরদ্বাজ মুনি বসহি” প্রয়াগা

মিনহি রামপদ অতি অনুরাগা—”

অর্থঃ স্ট্রাইক্‌ দি টেন্ট—প্রয়াগ যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু
ক'জ ত সহজ নয়! সন্ন্যাসীর যাত্রা কি না! পা-বাঁধা টাটু
খুজিয়া আনিয়া বোঝাই দিতে, উটের উপরে মহারাজের জিন
কসিয়া দিতে, গরুছাগল সঙ্গে লইতে, পোঁটলা পাটলি বাঁধিতে
গুছাইতে একবেলা গেল! তার পরে রওনা হইয়া সন্ধ্যার
প্রাক্কালে বিঠৌরা গ্রামপ্রান্তে এক বিরাট বটমূলে আশ্রয় লইয়া ফেলা
হইল। কিন্তু সেই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রয় পোঁছিতে যে কয়
মাস লাগিবে, সে ত অনুমান করিতেই পারিলাম না।

এই বিঠৌরা গ্রামের নামটা কেন আমার মনে আছে, তাহা
এইখানে বলিব। সে দিনটা পূর্ণিমা তিথি। গুরু-আদেশে
ভিকার জন্ম বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা বাড়ীর খোলা
দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটি বাঙ্গালী মেয়ের চেহারা চোখে
পড়িয়া গেল। ভাবিলাম, পাঁচ-ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায়
সব ঘরেই গিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে ত দূরের কথা—একটা
পুরুষের চেহারাও ত চোখে পড়ে নাই। ভিতরে প্রবেশ করিতেই
মেয়েটি আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজও

মনে করিতে পারি ! তাহার কারণ এই যে, দশ-এগারো বছরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন-উদাস চাহনি, আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাঙ্গাল করিয়া বলিলাম, চাটি ভিক্ষে আনো দেখি মা। প্রথমটা সে কিছুই বলিল না। তার পরে তার ঠোঁট দুটি বার-দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তার পরে সে বার বার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্বেই মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে এক নিশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তুমি কোথা থেকে আস্চ ? তুমি কোথায় থাক ? শোমার বাড়ী কি বর্দ্ধমান জেলায় ? কবে সেখানে যাবে ? তুমি রাজপুর জানো ? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেন ?

আমি কহিলাম, তোমার বাড়ী কি বর্দ্ধমানের রাজপুরে ?

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, হাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাদের তুমি চেনো ? আমি তিনমাস শশুরবাড়ী এসেছি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে, কিচ্ছ জানিনে। ঐ যে অশ্বথ গাছ—ওর তলায় আমার দিদির শশুরবাড়ী। ও-সোমবারে দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে—এরা বলে, না—সে কলেরায় মরেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দিদি গলায় দড়ি দিলে কেন ?

সে কহিল, দিদি রাজপুরে বাবার জন্ম দিনরাত কাঁদত, খেত

না, শুভ না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে।

প্রশ্ন করিলাম, তোমারও শশুর-শাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী ?

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে—আমি ত দিন-রাত কাঁদি ; কিন্তু বাবা আমাকে চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে তোমার বিয়ে দিলেন কেন ?

মেয়েটি কহিল, আমরা যে হেওয়ারী। আমাদের ঘর ও-দেশে ত পাওয়া যায় না।

তোমাকে কি এরা মার-ধোর করে ?

করে না ? এই দেখ না, বলিয়া মেয়েটি বাঁহাতে, পিঠের উপরে, গালের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কহিল, আমিও দিদির মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব। আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বলবে ত আমাকে একবার নিয়ে যেতে ? নইলে আমি—বলিতে আমি কেননামতে একটা ঘাড় নাড়িয়া সায়া দিয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুকচেরা আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতেই লাগিল।

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটা মুদির দোকান। খাত্তস্রব্য ভিক্ষা না করিয়া একখানা চিঠির কগজ ও কালি-কলম চাহিয়া বসিলাম, সে কিছু আশ্চর্য্য হইল বটে, কিন্তু প্রত্যাখান করিল

না। সেইখানে বসিয়া গৌরী তেওয়ারীর নামে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। এ কথাও লিখিতে ছাড়িলাম না যে, মেয়েটির দিদি সম্প্রতি গলায় দড়ি দিয়া নরিয়াছে, এবং সেও মার-ধোর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথে বাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। তুমি নিজে আসিয়া ইহার বিহিত না করিলে কি ঘটে বলা যায় না। জানি না, সে পত্র গৌরী তেওয়ারীর কাছে পৌঁছিয়াছিল কি না; এবং পৌঁছাইলে সে কিছু করিয়াছিল কি না। কিন্তু বাপারটা আমার মনের মধ্যে এমনি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতকাল পরেও সমস্ত স্মরণ রহিয়াছে; এবং এই আদর্শ হিন্দু-সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজও যায় নাই।

হইতে পারে, এই জাতিভেদ বাপারটা খুব ভাল; এই উপায়েই সনাতন হিন্দু জাতিটা যখন আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তখন ইহার প্রচণ্ড উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় করিবার আর কিছুই নাই। কিন্তু কোনমতে টিকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিই ত টিকিয়া আছে। কুকিরা আছে, কোল-ভীল সাঁওতালরা আছে, প্রশান্ত-মহাসাগরে অনেক ছোটখাটো দ্বীপের অনেক ছোটখাটো জাতির মানুষ-সৃষ্টির সুরূপ হইতেই বাঁচিয়া আছে। আফ্রিকায় আছে, আমেরিকায় আছে, তাহাদেরও এমন সকল কড়া সামাজিক আইন কানুন আছে যে, শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়সের হিসাবে তাহারা যুরোপের অনেক জাতির অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন। কিন্তু তাই বলিয়াই যে, ইহার

আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার-ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ, এমন অদ্ভুত সংশয় বোধ করি কারো মনে উঠে না।

দোকান হইতে উঠিলাম। সন্ধান করিয়া বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাঞ্চে ফেলিয়া দিয়া যখন আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার অন্যান্য সহযোগীরা ফিরিয়া আসে নাই।

দেখিলাম, সাধুবাবা আজ যেন কিছু বিরক্ত। হতুটা গিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন; বলিলেন, এ গ্রামটা সাধুসন্ন্যাসীর প্রশিক্ষণের অনুরক্ত নয়; সেবাতির ব্যবস্থা এমন সন্তোষজনক করে না; সুতরাং কালই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। সে প্রস্তাব, বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম।

পরদিন তাঁবু ভাঙিয়া যাত্রা করা হইল; এবং সাধুবাবা যথা-শক্তি ভরদ্বাজ মূর্তির আশ্রমের দিকে সদলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু পাটনার দশক্রোশের মধ্যে আর তাঁবু গাড়িলেন না। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে জায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল, তাহার নাম ছোট বাঘিয়া। আর স্টেশন হইতে ক্রোশ-আষ্টেক দূরে। এই গ্রামে একটি মহাপ্রাণ বাঙালা ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁর নাম রামবাবু। এই গ্রামে তিনি দ্বিতীয় পক্ষ এবং গুটি তিন-চার পুত্র-কন্যা লইয়া তখন স্মৃথে বাস করিতেছিলেন।

সকাল-বেলা শেনা গেল, এই ছোট-বড়বাঘিয়াতে থেটেই, আরও পাঁচ-সাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত মহামারাক্রমে দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, গ্রামের এই সকল দুঃসময়ের মধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা বেশ সন্তোষজনক হয়।

স্বতরাং সাধুবাবা অবিচলিতচিত্তে তথায় অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

একটুখানি ধূনির ছাই এবং দুফোঁটা কমণ্ডলুর জলের পরিবর্তে যে সকল বস্তু হু হু করিয়া ঘরে আসিতে লাগিল, তাহা সম্মাসী, গৃহা কাহারও বিরক্তিকর হইতে পারে না।

রামবাবু সস্ত্রাক কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন। চারিদিন জ্বরের পর আজ সকালে বড়ছেলের বসন্ত দেখা দিয়াছে, এবং ছোট-ছেলেটি কাল রাত্রি হইতেই জ্বরে অটুত। বাঙ্গালী দেখিয়া আমি উপযাচক হইয়া রামবাবুর সহিত পরিচয় করিলাম।

দিন-পনের পরে, রোগের যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন সাধুজা তাঁহার আস্তানা গুটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রামবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, সম্মাসীদাদা, তুমি ত সত্যিই সম্মাসী নও—তোমার শরীরে দয়া-মায়্যা আছে। আমার নবীন, জীবনকে তুমি ফেলে চ'লে গেলে, তারা কখ'নো বাঁচবে না। কই, যাও দেখি কেমন ক'রে যাবে? বলিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া ফেলিলেন। সাধুবাবাকে বলিলাম, প্রভু, তোমরা অগ্রসর হও; আমি পথের মধ্যে না পারি, প্রয়াগে গিয়া যে তোমার পদধূলি মাথায় লইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রভু ক্ষুণ্ণ হইলেন। শেষে নিরর্থক কোথাও বিলম্ব না করি, সে বিষয়ে বারংবার সতর্ক করিয়া দিয়া সদলবলে যাত্রা করিলেন। আমি রামবাবুর বাটীতেই রহিয়া গেলাম।

ছেলে দুটি সারিয়া উঠিল। মারী এইবার প্রকৃতই মহামারী-রূপে দেখা দিলেন। অতএব লোক পলাইতে আরম্ভ করিল

—ইহার আর কোন বাচবিচার রহিল না। যে বাড়ীতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত—শুধু মা তাঁর পীড়িত সন্তানকে আগ্লাইয়া বসিয়া আছেন।

রামবাবুও তাঁহার ঘরের গরুর গাড়াতে জিনিষপত্র বোঝাই দিলেন। আমার সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুর বেলা যাহা কিছু খাইলাম অপরাহ্ন-বেলায় বমি হইয়া গেল। রাত্রি নটা-দশটার সময় টের পাইলাম জ্বর হইয়াছে। সেদিন সারারাত্রি পরিয়াই তাঁহাদের উদ্যোগ আয়োজন চলিঃছিল, সবাই জাগিয়া ছিলেন।

কতক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, বেলা হইয়াছে। বাড়ীর ভিতর ঘরে ঘরে তালি বন্ধ—জনপ্রাণী নাই।

বাহিরের যে ঘরটায় আমি থাকি তাম তাহার স্তম্ভ দিয়াই এই গ্রামের কাঁচা রাস্তাটা আরা স্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ-ছয়খানা গরুর গাড়ী য়ুত্ৰাভাও নরনারী বোঝাই লইয়া স্টেশনে যাইত। ইহারই একখানিতে সন্ধ্যার সময় স্থান করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিলাম। যে প্রাচীন বেহারী ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, তিনি অতি প্রত্নাবেই স্টেশনের কাছে একটা গাছতলায় আমাকে নামাইয়া দিলেন। অদূরে একটা পরিত্যক্ত টিনের শেড ছিল। ভদ্রলোক স্টেশন হইতে একজন বাঙ্গালী যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহারই দয়ায়, জন-কয়েক কুলার সহযোগেই এই শেডখানির মধ্যে নীত হইলাম।

আমি যুবকটির কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না ; তবে তাঁহার কথা শুনিয়া এইমাত্র জানিয়াছিলাম, তিনি পূর্ববঙ্গের লোক এবং পনের টাকা বেতনে স্টেশনে চাকরী করেন। তিনি তাঁহার নিজের শতজ্ঞান বিছানাটি আনিয়া হাজির করিলেন। দুপুর-বেলা একবাটি গরম দুধ আনিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবেন ; কিন্তু আত্মীয়বন্ধুবান্ধব কাহাকেও যদি সংবাদ দিবার থাকে ত ঠিকানা দিলে তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে পারেন।

বলিলাম, আমি সন্মাসা মানুষ, আমার যথার্থ আপনার জন কেউ নাই। তবে পাটনায় পিয়ারী বাইজীর ঠিকানায় যদি একখানা পোস্টকার্ড লিখে দেন, যে শ্রীকান্ত আরা স্টেশনের বাইরে একটা টিন-শেডের মধ্যে মরণাপন্ন হ'য়ে প'ড়ে আছে, তা হ'লে—

ভদ্রলোক শশবাস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি এখনি দিচ্ছি, চিঠি এবং টেলিগ্রাফ দুই-ই পাঠিয়ে দিচ্ছি ; বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ভগবান, সংবাদটা যেন স পায়।

* * * * *

জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় হাত দিয়া ঠাহর করিয়া টের পাইলাম, সেটা আইস্-বাগ। চোখ মেলিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপরে শুইয়া আছি। স্নায়ুখের টুলের উপর একটা আলোর কাছে গোটা দুই-তিন ঔষধের শিশি ; এবং তাহারই পাশে একটা দড়ির

খাটিয়ার উপর কে একজন লাল-চক্‌ রাপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পরাস্ত কিছুই স্মরণ করিলে পারিলাম না। তার পরে একটু একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের খায়ে ক'কি যেন অঙ্গ দেখিয়াছি। অনেক লোকের আস-যাওয়া, পরামর্শ করিয়া আমাকে ডিলে। .লা, মাথা গাড়া করিয়া ওষধ খাওয়া—এমন ক'কি বাপাব।

খানিক পরে লোকটি যখন উঠিয়া বসিল, দেখিলাম তঁনি একজন বাঙালী ভদ্রলোক, বয়স আঠারে উনিশের বেশ নয়। এখন আমার শয়রের নিকট হইতে মৃতদেহে যে তাকে সম্বোধন করিল, তার গলা চিন্তে পারিলাম।

পিয়রা অতি মৃত-কণ্ঠে ডাকিল, বন্ধু, বরফটা একবার কেন বদলে দিনে বাবা!

তলেটি বলিল, দিচ্চ, তুমি একটুখানি শোও না মা। ডাক্তারবাবু যখন ব'লে গেলেন, এসস্ত নয়, এখন ত আর কোন ভয় নেই মা।

পিয়রা কহিল, ওরে বাবা, ডাক্তারে ভয় নেই বললেই কি মেয়েমানুষের ভয় যায়? .গকে সে ভাবনা কর্তে হবে না বন্ধু, তুই শুধু বরফটা বদলে দিয়ে শুয়ে পড়—আর রা. জাগিস্‌নে।

বন্ধু আসিয়া বরফ বদলাইয়া দিল এবং ফিরিয়া গিয়া সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, আমি আস্তে আস্তে ডাকিলাম, পিয়রা!

পিয়রা মুখের উপর কুঁকিয়া পড়িয়া, কপালের জলবিদুগুলা

আঁচলে মুচাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে কি চিন্তে পার্চ ?
এখন কেমন আছ ? কা—

ভাল আছি । কখন এলে ? এ কি আরা ?

হাঁ, আরা । কাল আমরা বাড়ী যাব ।

কোথায় ?

পাটনায় । আমার বাড়ী ছাড়া আর কি কোথাও এখন
তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি ?

এই ছেলেটি কে রাজলক্ষ্মী ?

আমার সতানপো । কিন্তু বন্ধু আমার পেটের ছেলেই ।
আমার কাছ থেকেই ও পাটনা কলেজে পড়ে । আজ আর কথা
কোয়ো না, ঘুমোও —কাল সব কথা বলব । আমি পাশ ফিরিয়া
শুইলাম ।

বার

ভোর-বেলা পিয়ারী কহিল, বন্ধু, আর দেরি করিস্ নে বাবা,
এই-বেলা একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী রিজার্ভ ক'রে আয় ।
আমি একদণ্ডও এখানে রাখতে সাহস করি নে ।

বন্ধু অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ হাত ধুইয়া কাপড়
ছাড়িয়া মেশনে চলিয়া গেল । তখন ধীরে ডাকিলাম, পিয়ারী !
আজ জর আমার কদিন হ'ল ?

তেরো দিন, বলিয়া সে কতই যেন একটা বস্মীয়সী প্রবীণার
মত গম্ভীরভাবে কহিল, দেখ ছেলেপিলেদের সাম্নে আর আমাকে

ও ব'লে ডেকে না। চিরকাল লক্ষ্মী ব'লে ডেকেচ, তাই কেন বল না ?

বলিলাম, আচ্ছা। কিন্তু তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে চাইনা। আমি ভাবছি এখন যেমন আছি, তাতে তিন-চার দিনেই বোধ হয় এক রকম সেরে যাবো।

পিয়ারা একটু হাসিয়া কহিল, তিন-চারদিনে না হোক দশ-বারোদিনে এ রোগ স'রবে তা জানি, কিন্তু আসল রোগটা কতদিনে স'রবে, আমাকে বলতে পারো ?

আসল রোগ অব'র কি ?

পিয়ারা কহিল, ভাববে একরকম, বন্ধবে একরকম, করবে আর একরকম—চিরকাল ঐ এক রোগ। সম্মাসী নও, সম্মাসী সেজে কি হাস্যমাই বাধালে ! এসে দেখি, মাটির ওপর টেঁড়া কাঁথায় প'ড়ে অঘোর অট্টোত্ত ! মাথাটা ধুলো-কাদায় জট পাকিয়েছে ; সর্বদাঙ্গ রুদ্রাঙ্গি নীধা ; হাতে দুগাছা পেতলের বাল।। না গো মা ! দেখে কেঁদে বাঁচিলে ! বলিয়া সে একটা দাঁতশ্বাস ত্যাগ করিল।

সেই রাত্রেই আমরা আরা ত্যাগ করিলাম।

পাটনায় পৌঁছিয়া বারো-তেরোদিনের মধ্যেই একপ্রকার সারিয়া উঠিলাম। একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ী ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাব-পত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। কোন ঘরে আবশ্যকীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত একটা বস্ত্রও চোখে পড়িল না ; এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া দোতলার একটা কোণের ঘরের দরজার স্তম্ভে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মেজেটি শাদা পাথরের,

দেওয়ালগুলি দুধের মত শাদা বকবক করিতেছে। ঘরের একধারে একটি ছোট তক্তাপোষের উপর বিছানাপাতা, একটি কাঠের আল্‌নায় খান-কয়েক বস্ত্র এবং তাহারই পিছনে একটি লোহার আলগারি। আর কোথাও কিছু নাই, ভিতরে ঢুকিলাম। বোধ করি ক্রান্তিবশতঃই শয্যায় আসিয়া বসিয়াছিলাম, না হঠাৎ ঘরে আর কিছু বসিবার জায়গা থাকিলে তাহাতেই বসিলাম। স্তম্ভের খোলা জানালা ঢাকিয়া একটা মস্ত নিমগাছ : তাহারই ভিতর দিয়া বির বির করিয়া বাতাস আসিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া হঠাৎ কেমন একটা অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা নিষ্ট শব্দে চমকিত হইয়া দগিলাম, গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পিয়ারা ঘবে ঢুকিয়াছে। সে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ঘরে ভিজা কাপড় ছাড়িতে আসিয়াছে। সে এদিকে একেবারেই তাকায় নাই। সাজা আল্‌নার কাছে গিয়া শুকবস্ত্রে হাত দিতেই, আমি বাস্ত হইয়া সাড়া দিলাম—যাটে কাপড় নিয়ে যাও না কেন ?

পিয়ারী চমকিয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, ঐ—চোরের মত আমার ঘরে ঢুকে বসে আছে ? না, না, বোস বোস,—যেতে হবে না ; আমি ও-ঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসছি, বলিয়া লঘু পদক্ষেপে গরদের কাপড়খানি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে প্রফুল্লমুখে ফিরিয়া আসিয়া, হাসিয়া কহিল, আমার ঘরে ত কিছুই নেই ; তবে কি চুরি করতে এসেছিলে বল ত ?

আমি বলিলাম, আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ পেয়েছ ? আমি অত লোভী নই। তুমি না গেলে আমাকে সেই ধূলোবালির উপরেই ম'রে থাকতে হ'ত, কেউ ততদূর গিয়ে একবার হাসপাতালে পাঠবার চেষ্টা পর্য্যন্তও করত না ! সেই যে চিঠিতে লিখেছিলে, সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে যেন মনে করি—নেহাৎ পরমায়ু ছিল বলেই কথাটা মনে পড়েছিল, তা এখন বেশ বুঝতে পারি।

পারো ?

নিশ্চয়।

তা হ'লে আমার জন্মই প্রাণটা ফিরে পেয়েছ বল ?

তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

পরদিন বিকাল-বেলায় আমার ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় একটা ইঞ্জি-চেয়ারে শুইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলাম, বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করবার সুযোগ হয় নাই। এষ্ট চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, বন্ধু, কি পড় তুমি ?

ছেলেটি অতিশয় শাদা-সিধা ভালমানুষ। কহিল, গতবৎসর আমি এণ্ট্রান্স পাশ করেছি।

এখন তা হ'লে বাঁকিপুর কলেজেই পড় ত ?

আজ্ঞে হাঁ।

তোমার কটি ভাই বোন ?

ভাই আর নেই। চারটি বোন।

তাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে ?

আজ্ঞে হাঁ। মা-ই বিয়ে দিয়েছেন।

তোমার আপনার মা বেঁচে আছেন ?

আজ্ঞে হাঁ, তিনি দেশের বাড়ীতেই আছেন।

তোমার এ মা কখনো দেশের বাড়ীতে গেছেন ?

অনেক বার। এই ত পাঁচ-ছ'মাস হ'ল এসেছেন।

সেজন্ম দেশে কোন গোলযোগ হয় না ?

বন্ধু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, হলোই বা। আমাদের একঘরে ক'রে রেখেচে ব'লে ত আর আমি আপনার মাকে ত্যাগ করতে পারি নে ! আর অমন মা-ই বা কজনের আছে ! আচ্ছা, আপনিই বলুন, গান-বাজনা করাতে কি কোন দোষ আছে ? আমার মা ত শুধু তাই করেন। পবনিন্দে পরচর্চা ত করেন না ? বরঞ্চ গ্রামে আমাদের যারা পরম শত্রু, তাদেরই আট-দশজন ছেলের পড়ার খরচ দেন ; শীতকালে কত লোককে কাপড় দেন, কস্মল দেন। এ কি মন্দ কাজ করেন ?

আমি বলিলাম, না ; এ ত খুব ভাল কাজ।

বন্ধু উৎসাহিত হইয়া কহিল, তবে বলুন ত। আমাদের গাঁয়ের মত পাজী গাঁ কি কোথাও আছে ? এই দেখুন না, সে-বছর ইঁট পুড়িয়ে আমাদের কোঠা-বাড়া তৈরী হ'ল। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখে মা আমার মাকে বল্লেন, দিদি, আরও কিছু টাকা খরচ করে ইঁটখোলাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই। তিন-চারহাজার টাকা খরচ ক'রে তাই করে দিলেন, ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন ; কিন্তু গাঁয়ের লোক সে পুকুর 'মাকে প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না। অমন জল—কিন্তু কেউ খাবে না, ছোঁবে না, এমনি

বজ্জাত লোক। কেবল এই হিংসায় সবাই ম'রে যায় যে, আমাদের কোঠা-বাড়ী তৈরী হ'ল। বুঝলেন না?

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, বল কি হে? এটি দারুণ জলকষ্ট ভোগ করবে, তবু অমন জল ব্যবহার করবে না?

বন্ধু একটু হাসিয়া কহিল, তাই হ'ল। কিন্তু সে কি বেশী দিন চলে? প্রথম বছর ভয়ে কেউ সে জল ছুঁলো না; কিন্তু এগুন ছাটলোকেই, সবাই নিজে, থাচ্ছে বামন-কায়েওয়াও চৈত্র-বৈশাখ মাসে লুকিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু সব পুকুর প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না—এ কি মায়ের কম কষ্ট?

আমি কহিলাম, নিজেব নাকি কটে পড়ে যা'না ভাঙবার যে একটা কথা আছে, এ'র দর্শন হ'ল।

বন্ধু জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই! এমন গায়ে আলাদা, একধারে হয়ে থাকে শাপে বর। আপনি কি বলেন? প্রত্যন্তরে আমি শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম। তা'না স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সজ্জা বন্ধুর উদ্দাপনা বাধা পাইল না। দেখিলাম, ছলেটি তাহার বিমাতাকে সহ্যই ভালবাসে। অনুকূল শ্রোতা পাইয়া সে মাণিয়া উঠিল, আনাকে প্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

ইহাৎ এক সময়ে তাহার ছাঁস হইল যে, এতক্ষণের মধ্যে আমি একটি কথাতেও কথা যোগ করি নাই। তখন সে অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্ত প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না, কাল সকালেই আমি যাচ্ছি।

কাল ?

হা, কালই।

কিন্তু আপনার দেহ এখনো সবল হয়নি অসুখটা একেবারে সেরেচে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে ?

বলিলাম সকাল পর্যন্ত সেরেচে বলেই মনে হয়েছিল বটে : কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না। আজ দুপুর থেকেই আমার মাথাটা ধরেছে।

তবে কেন এত কষ্ট দাবেন ? এখানে * আপনার কোন কষ্ট নেই, আপনি এখন যাবেন না।

কেন বল দেখি ?

আপনি থাকলে মা বড় আনন্দে থাকেন। বলিয়া ফলিয়াই মুখ রাঙা করিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া গেল। দেখিলাম, ছলেটি খুবই সরল বটে, কিন্তু নিবেদ্য নয়। পিয়ারী কোন যে বলিয়াছিল, আর বেশি দিন থাকলে আমার ছলে কি ভাবে। কথাটার অর্থটা যেন বুঝিতে পারিলাম বলিয়া মনে হইল : মাতৃহের এই একটা ছবি আজ চাখে পড়ায় যেন একটা নতুন জ্ঞান লাভ করিলাম। পিয়ারী যে মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্মৃতিতে গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শত পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বেঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে এখন দিতেই হইবে!

চাখের উপর সূয়া অস্ত গেল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গলিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। মনে

মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না ।

অন্যমনস্ক হইয়া সেইখানেই বসিয়া ছিলাম ; সন্ধ্যার সময় পুনোচিত্তে ধূপ-ধূনা দিয়া, সেটা হাতে করিয়া রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর একটা ঘরে যাইতেছিল ; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাথা ধবেচে, হিমে বসে কেন, ঘরে যাও ।

হাসি পাইল । বলিলাম, অবাক করলে লক্ষ্মী ! হিম এখানে মাথায় ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হিম না থাকে ঠাণ্ডা বাতাস ত বইচে ! সেইটাই কোন্ ভাল ?

না, সেও তোমার ভুল ! ঠাণ্ডা গরম কোন বাতাসই বইচে না ।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার সমস্তই ভুল । কিন্তু মাথাধরাটা : আর আমার ভুল নয়—সেটা ত সত্যি ? ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড় না ? বতন কি কর্চে ? সে কি একটু ওডিকোলন মাথায় দিয়ে দিতে পারে না ? এ বাড়ীর চাকরগুলোর মত 'বাবু'চাকর আর পৃথিবীতে নেই । বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাজে চলিয়া গেল ।

রতন যখন বাস্তব এবং লজ্জিত হইয়া ওডিকোলন, জল প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল, এবং তাহার ভুলের জ্ঞান বারংবার অমুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না ।

রতন সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, এতে আমার যে দোষ নেই, সে কি আমি জানিনে বাবু ? কিন্তু মাকে ত বলবার

জো নেই যে, তুমি রেগে থাকলে মিছিমিছি বাড়ীশুদ্ধ লোকের দোষ দেখতে পাও !

কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম, রাগ কেন ?

রতন কহিল, সে কি কারো জান্‌বার জো আছে ? বড়লোকের রাগ বাবু শুধু শুধু হয় আবার শুধু শুধুই যায়। তখন গা ঢাকা দিয়ে না থাকতে পারলেই চাকর-বাকরদের প্রাণ গেল ! দ্বারের নিকট হইতে হঠাৎ প্রশ্ন আসিল, তখন তাদের কি আমি মাথা কেটে নিই রে রতন ? আর বড়লোকের বাড়ীতে যদি এত জ্বালা ত আর কোথাও হাসনে কেন ?

মনিবের প্রশ্নে রতন কুণ্ঠিত অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, শের কাজটা কি ? ওঁর মাথা ধরেছে—বন্ধুর মুখে শুনে আমি তোকে জানালুম। তাই এখন আটটা রাত্রির এসে আমার সুখ্যাতি গাইচিস্। কাল থেকে আর কোথাও কাজের চেষ্টা করিস্—এখানে হবে না। বুঝলি ?

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে, রতন ওড়িকোলন জল দিয়া আমার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিরা জিজ্ঞাসা করিল, কাল সকালেই না কি বাড়ী যাবে ?

আমার যাবার সঙ্কল্প ছিল বটে, কিন্তু বাড়ী ফিরিবার সঙ্কল্প ছিল না। তাই প্রশ্নটার আর-একরকম করিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, কাল সকালেই যাব।

সকালে কটার গাড়ীতে যাবে ?

সকালেই বেরিয়ে পড়ব—তাতে যে গাড়ী জোটে।

আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবলের জন্তু কাউকে না হয় স্টেশনে পাঠিয়ে দিই গে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপরে যথাসময়ে রতন কাজ সারিয়া প্রস্থান করিল। নীচে ভৃত্যদের শব্দ-সাদা নীরব হইল; বুঝিলাম, সকলেই এবার নিদ্রার জন্তু শয্যাশয় করিয়াছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটা কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিরারী বিরক্ত হইল কেন? এমন কি করিয়াছি যাহাতে সে আমার যাওয়ায় ভগ্ন হইত অধীর হইয়া উঠিয়াছে? রতন বলিয়াছিল, বড়লোকের কোথ শুধু শুধু হয়। কথাটা আর কোন বড়লোকের সম্বন্ধে খাটে কি না জানি না, কিন্তু পিরারী সম্বন্ধে কিছুতেই খাটে না। সে যে অত্যন্ত সংযমী এবং বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি; কিন্তু আমার উপর রাগ করিবার তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। সূত্রাৎ বিদায়ের সময় তাহার এই ঔদাসীন্য আমাকে যে বেদনা দিতে লাগিল, তাহা অকিপিতকর নয়।

অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙিয়া চাখ মেলিলাম। দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া ও-দিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। স্তম্ভের জানালাটা খোলা ছিল— তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয়্যার কাছে আসিয়া নশারির ধারগুলি ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্ত বুঝিলাম। যে গোপনেই

আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সকালে প্রস্তুত জ্বর লইয়াই ঘুম ভাঙিল। চোখ মুখ জ্বালা করিতেছে; মাথা এত ভারি যে, শয্যা ত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তবুও যাইতেই হইবে।

পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, এখন দেহটা কেমন আছে ?

বলিলাম, খুব মন্দ নয় ! যেতে পারব।

আজ না গেলেই কি নয় ?

হাঁ, আজ যাওয়া চাই।

তা হলে বাড়ী পৌঁছেই একটা খবর দিয়ো। নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।

তাহার অবিচলিত ধৈর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আমি বাড়ীতেই যাব। আর গিয়েই তোমাকে খবর দেব !

পিয়ারী কহিল, দিয়ো। আমিও চিঠি লিখে তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বাহিরে পাল্কিতে যখন উঠিতে যাইতেছি, দেখি দ্বিতলের বারান্দায় পিয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুকের ভিতরে যে কি করিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমার অন্নদাদিদিকে মনে পড়িল ! বহুকাল পূর্বের একটা শেষদিনে, তিনিও যেন ঠিক এমনি গম্ভীর, এমনি স্তব্ধ হইয়াই

দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সেই দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি আমি আজও ভুলি নাই, কিন্তু সে চাহনিতে যে তখন কত বড় একটা আসন্ন-বিদায়ের বাণী ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পড়িতে পারি নাই।

নিশ্বাস ফেলিয়া পাল্‌কিতে উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—উহা দূরেও টানিয়া ফেল। ছাটখাটো প্রেমের সম্বন্ধ ছিল না—এই স্তব্ধতা-পরিপূর্ণ স্তব্ধ স্নেহ ইহঁতে মঙ্গলের জন্ম, কল্যাণের জন্ম। আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারি না। বাতাসেরা পাল্‌কি লইয়া স্টেশন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে বারংবার বলিলাম—লাগিলাম, লক্ষ্যে, দৃষ্টি করিয়া না ভাই, এ ভালই হইল যে, আমি চলিলাম। তোমার স্বপ্ন ইহ-জীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে জীবন তুমি দান করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সঙ্কল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।

প্রথম পর্ব শেষ.



